স্বস্তিকা

দাম ঃ দশ টাকা

নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।। ১৮ এপ্রিল - ২০১১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৭
মদীয় আচার্যদেব ❑ স্বামী বিবেকানন্দ ❑ ৯
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনী ❑ হরিপদ ভৌমিক ❑ ১১
শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিপ্লব চেয়েছিলেন ❑ সঞ্জয় ভুঁইয়া ❑ ১৯
ঠাকুরের দুই সাধিকা ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ২৩
শ্রীরামকৃষ্ণ ও অভিনয় জগৎ ❑ স্বামী আত্মবোধানন্দ ❑২৭
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় সঙ্গীত ❑ অমিতাভ গুহঠাকুরতা ❑ ৩৫
ফাতনা ডোবার ইতিকথা ❑ অর্ণব নাগ ❑ ৪৩
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত ❑ বিনায়ক সেনগুপ্ত ❑ ৫১
'নৈঃশব্দের রূপ'-এ রূপময় শ্রীরামকৃষ্ণ ❑ শ্যামলেশ দাস ❑ ৫৯

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা
৬৩ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ৪ বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৩— ১৮ এপ্রিল - ২০১১
।। দাম ১০ টাকা।।

তব চরণতলে

মজার ঠাকুর হেন না হয় শ্রবণ।
দেখনে নখের কোণে গোটা ত্রিভুবন।।
দেখিবারে আঁখির সাহায্য নাহি লাগে।
রামকৃষ্ণ-লীলাকথা হৃদে যার জাগে।।

বেদান্ত গ্রন্থে রহিয়াছে—'জীবঃ ব্রহ্মৈব ন পরঃ' অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম। জীব এবং ব্রহ্ম দুই-ই এক। মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছে। বেদান্তের এই বাণী আমরা ঠাকুরের কণ্ঠে নতুন ভাবে শুনিতে পাইয়াছি। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বে তাহা প্রচারিত ও কার্যকরও হইয়াছে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণবের অন্যতম কর্তব্য জীবে দয়া প্রসঙ্গে ঠাকুর বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন—মানুষ জীবে দয়া করিবে—তাহা কি করিয়া হয়? জীবের মধ্যে যে ব্রহ্ম রহিয়াছে, তাঁহাকে দয়া করিবার, মানুষ কে? তাহা হইতে পারে না। জীবে দয়া নহে, জীব সেবা- শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বয়ং ঈশ্বরের সেবা করিতেছি এই বোধে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানুষের সেবা করিতে হইবে—দয়া নয়। 'দয়া' শব্দের মধ্যে অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যের ভাব রহিয়াছে। উপনিষদেই রহিয়াছে—'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। তাই ঠাকুর বলিয়াছেন—জীবে দয়া নয়, সেবা। আর শুধু সেবা নয়, শিবজ্ঞানে সেবা। ঠাকুর আরও বলিতেন—চোররূপী নারায়ণ, দৃষ্টরূপী নারায়ণ। যে চোর তাহার মধ্যেও নারায়ণ রহিয়াছে। হয়তো সুপ্ত অথবা অপ্রকাশিত। তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে— তুমি স্বরূপতঃ ঈশ্বর। তোমার মধ্যে সেই সম্ভাবনাকে তুমি বাস্তবায়িত কর। দেশের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে, সমাজের কল্যাণে তোমাদের শক্তিকে জাগরিত কর। তিনি জ্ঞানী। বিজ্ঞানীও। সমাজ বিজ্ঞানী তিনি মানুষের চিরন্তন ধর্ম সাধনার বাণীরূপ। লোকশিক্ষক তিনি। সমাজ সংস্কারকও তিনি। ধর্মের শেষ বাক্যটি তিনি দেব ভাষায় নয়, কথ্য ভাষায় বলিতে আসিয়াছিলেন। তাই তিনি এই সবকথা বলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ঈশ্বর লাভের পর চতুর্দোলায় চাপিলে হইবে না। লোকশিক্ষার জন্য নেমে আসিতে হইবে জনজীবনে। মানুষের মধ্যে সাধারণত আঠারোটি শক্তির বিকাশ হইতে পারে। এর যে কোনও একটি বা দু'টি শক্তির যথার্থ উৎকর্ষ হইলেই মানুষ জগৎশ্রেষ্ঠ হয়। ঠাকুর বারে বারে মন মুখ এক করার উপদেশ দিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে ঠাকুরকে চাকুরি প্রদানে যিনি ছিলেন নিয়োগকারীর ভূমিকায় সেই মথুরামোহন বিশ্বাস পরে হইলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত। জগতের কাজকারবারের মালিক বোধহয় অদৃষ্টের এরকম লিখনই

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক,

শুভ নববর্ষে জানাই প্রীতিপূর্ণ নমস্কার।

এই নববর্ষ সংখ্যাটি থেকে স্বস্তিকা নবকলেবরে প্রকাশিত হতে চলেছে। যুগোপোযোগী ও সংরক্ষণযোগ্য করার লক্ষ্যে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। আপনারা সকলেই জানেন, জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দুত্ব অর্থাৎ জাতীয়ভাব, জাতীয়স্বার্থ ও জাতীয় স্বাভিমান রক্ষায় স্বস্তিকা সোচ্চার। এককথায়, ভারত আত্মার কণ্ঠস্বর। আপনাদের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই স্বস্তিকা দীর্ঘ ৬৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। নতুন আঙ্গিকেও পত্রিকার আলোচ্য বিষয়গুলি তত্ত্ব, তথ্য ও চিত্রের মাধ্যমে আরও আকর্ষণীয় করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের আবশ্যকতা অনুভব করছি। আমাদের প্রিয় পত্রিকাটি এত বছর ধরে চললেও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে ততটা সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি। তাই আপনারা যদি বস্তুপক্ষে একজনকেও স্বস্তিকার গ্রাহক করেন তাহলে তা এক্ষেত্রে একটা অগ্রগতির সূচক বলে গণ্য হবে। আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবো— এই প্রত্যাশা রইলো।

ধন্যবাদ সহ—
বিজয় আঢ্য
সম্পাদক, স্বস্তিকা

লিখিয়াছিলেন। কেননা নিজের ভিতর নিজেকেই লুকিয়ে রাখা ঠাকুর ফাঁকি দিতে পারিলেন না মথুরামোহনকে। ঠাকুরের রসদ্দার মথুরামোহন যে অবতারবরিষ্ঠের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেই আসিয়াছিলেন জগতে। আর গিরিশ? তিনি ঠাকুরের প্রাণের জন। সবকিছুই বকলমা দিয়াছিলেন ঠাকুরকে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ঠাকুর যে ঠিক কত জনের অভিভাবক তাহা নির্দিষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁর কাছে আসিয়াছেন তাঁহাদের কথা ভিন্ন কিন্তু ঠাকুরের নশ্বর দেহ চলে যাইবার পরও কতজন যে তাঁহার অলৌকিক কৃপা লাভ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ তাঁহার মহাপ্রয়াণের মাত্র একশত বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের ভাবাদর্শের দিকে আজও মানুষ অগ্নিমুখী পতঙ্গের মতো ধাওয়া করিতেছে কিসের টানে? আজ আধুনিক সভ্যতা এবং ধর্মপ্রচারের আড়ালে দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার অপচেষ্টা চলিতেছে। এই অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করিবার সাথে সাথে সনাতন ধর্ম এবং সনাতন সংস্কৃতি ও পরম্পরা বিষয়ে সচেতন করিবার নিরন্তর প্রয়াস প্রয়োজন। এই প্রয়াস যাহাতে বোধগম্য হয় তাহার জন্য বিশেষ শৈলীর প্রবর্তনও প্রয়োজন।

হিন্দুত্বের নির্যাস খুঁজিয়া ছিলেন রামকৃষ্ণ। বিবেকানন্দও তাই করিয়াছেন।

এই তত্ত্ব সমর্থন করিয়া ঋষি অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন— *"When therefore it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise. When it is said that India shall be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great. When it is said that India shall expand and extend itself, it is the Sanatan Dharma that shall expand and extend itself over the world. It is for the dharma and by the dharma that India exists."*

স্বামীজী'র 'আক্রমণাত্মক হিন্দুত্ব'-এর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতমায়ের সঙ্কটের মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্ম। ১৯২৫ সালে যে ক্ষুদ্র চারা গাছটি ভারত-মৃত্তিকার বুকে প্রোথিত হইয়াছিল, আজ তাহা মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া ভারতবাসীকে নিশ্চিন্ত তরুতলে আশ্রয় দিয়াছে। আর এস এসের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রামাণ্য দলিল ওয়াল্টার কে আণ্ডারসন ও শ্রীধর ডি ডিমেল কর্তৃক 'দ্য ব্রাদারহুড ইন স্যাফ্রন' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে *'...many revivalist activists, including the founders of the RSS (পরমপূজনীয় ডাঃ হেডগেওয়ার) were inspired by Vivekananda's message. The second head of the RSS (পরমপূজনীয় মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) was himself an ordained member of the order'* । সবই ঠাকুরের পরম কৃপা। জয় রামকৃষ্ণ।

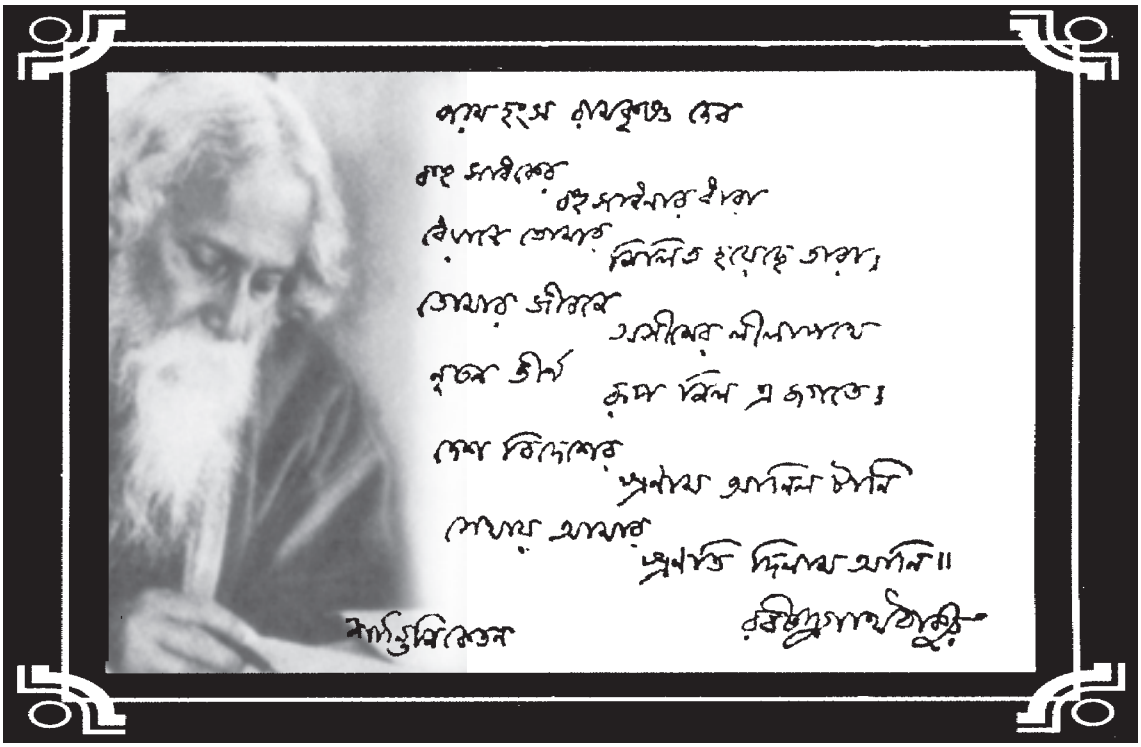

মদীয় আচার্যদেব

স্বামী বিবেকানন্দ

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের--- ভুলগুলি কেবল আমার।

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক। হে আমেরিকাবাসী নরনারীগণ, তোমাদের মধ্যে যদি এরূপ পবিত্র, অনাঘ্রাত পুষ্প থাকে, উহা ভগবানের পাদপদ্মে প্রদান করা উচিত। যদি তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণ থাকেন, যাঁহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, যাঁহাদের বেশী বয়স হয় নাই, তাঁহারা ত্যাগ করুন। ধর্মলাভের ইহাই রহস্য—ত্যাগ কর। প্রত্যেক রমণীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। কি ভয়? যেখানেই থাক না কেন, প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সন্তানগণের ভারগ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহস করিয়া ত্যাগ কর দেখি। এইরূপ প্রবল ত্যাগের প্রয়োজন। তোমরা কি দেখিতেছ না, প্রাশ্চাত্য দেশে জড়বাদের কি প্রবল স্রোত বহিতেছে? কতদিন আর চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া থাকিবে? তোমরা কি দেখিতেছ না, কী কাম ও অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া লইতেছে? তোমরা কেবল বচনের দ্বারা অথবা সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা ইহা বন্ধ করিতে পারিবে না—ত্যাগের দ্বারাই এই ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্মাচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলে এই সকল ভাব বন্ধ হইবে। বাক্যব্যয় করিও না, কিন্তু তোমার দেহের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্যের শক্তি, ত্যাগের শক্তি বাহির হউক। যাহারা দিবারাত্রি কাঞ্চনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে ওই শক্তি গিয়া আঘাত করুক—তাহারা কাঞ্চন-ত্যাগী তোমাকে এই কাঞ্চনের জন্য বিজাতীয় আগ্রহের মধ্যে দেখিবামাত্র আশ্চর্য হউক। আর কামও ত্যাগ কর। এই কাম-কাঞ্চনত্যাগী হও, নিজেকে যেন বলিস্বরূপ প্রদান কর—আর কে ইহা সাধন করিবে? যাহারা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ—সমাজ যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে—তাহারা নহে, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহারা সর্বোত্তম ও নবীনতম, সেই বলবান্ সুন্দর যুবা-পুরুষেরাই ইহার অধিকারী, তাহাদিগকে ভগবানের বেদীতে সমর্পণ করিতে হইবে—আর এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার কর। জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া তাহারা সমগ্র মানবজাতির সেবক হউক---সমগ্র মানবজাতির নিকট ধর্মপ্রচার করুক। ইহাকেই তো ত্যাগ বলে—শুধু বচনে ইহা হয় না। উঠিয়া দাঁড়াও এবং লাগিয়া যাও। তোমাদিগকে দেখিবামাত্র সংসারী লোকের মনে—কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মনে—ভয়ের সঞ্চার হইবে। বচনে কখনও কোনও কাজ হয় না—কত কত প্রচার হইয়াছে, কোনও ফল হয় নাই। প্রতি মুহূর্তেই অর্থ-পিপাসায় রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোনও উপকার হয় না, কারণ উহাদের পশ্চাতে কেবল ভুয়া—ওই সকল গ্রন্থের ভিতর কোনও শক্তি নাই। এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পার, তোমার বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহারই ভিতর তোমার ধর্মভাব গিয়া লাগিবে।

আধুনিক জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এই—"মতামত, সম্প্রদায়, চার্চ বা মন্দিরের অপেক্ষা করিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্ম, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার ততই জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্মধন উপার্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত, সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, ধর্ম অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, কিন্তু উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। কেবল যাহারা নিজেরা ধর্মলাভ করিয়াছে, তাহারাই অপরের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চারিত করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য হইতে পারে,—তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানজ্যোতিরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।"

কোনও দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, ততই সেই দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে

নাই, সেই দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এই—''প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।'' আর তিনি সকল দেশের দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ''তোমাদের ত্যাগের সময় আসিয়াছে।'' তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভাইস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমরা মুখে কেবল 'আমার ভ্রাতৃবর্গকে ভালবাসি' না বলিয়া তোমার কথা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যাও। এখন তিনি যুবকগণকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিতেছেন, ''হাত-পা ছেড়ে দিয়ে তালগাছ থেকে লাফিয়ে পড় এবং ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।''

ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে; অতএব জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখিতে পাইবে। বুঝিবে—বিবাদের কোনও প্রয়োজন নাই; আর তখনই সমগ্র মানব জাতির সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, সকল ধর্মের মধ্যে যে মূলে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা! অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান্ আচার্য নিজের জন্য কোনও দাবি করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সেগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনী

হরিপদ ভৌমিক

'রামকৃষ্ণ কে? কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাংলায় এমন সোনার চাঁদ গোরাচাঁদের পর আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক রয়েছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্করেখাটুকুও নাই। আহা, তাঁহার ভগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল।...

রামকৃষ্ণ কে। তিনি সাধক-চূড়ামণি। উচ্ছাসময়ী, আবেগময়ী, ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে— যোগীর সমাধি গোপীজনের মাধুর্য শাক্তের ভৈরবভাব অভেদ-সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। তিনি মহম্মদীয় সাধনাও করিয়াছিলেন, এমনকি তিনি যীশুভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন আর্যধর্মের পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল ভেদভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈতবিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ-কামিনী-কাঞ্চন-বিজয়ী-ব্রহ্মবিজ্ঞানী-তর্কচূড়ামণি, লোকরক্ষার সেতু, ভাবসমন্বয়ের সাগর নমস্তে রামকৃষ্ণায়।'

উপরের কথাগুলি বলেছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।[১] তখন শিক্ষিত সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম প্রকাশ করেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৭৫ সালের ১৫ মার্চ। প্রথম দর্শনেই তিনি মুগ্ধ, 'প্রথম মিলনেই উভয়ের হৃদয় এক হইয়া যায়'।

শ্রীরামকৃষ্ণের গুণমুগ্ধ আচার্য কেশবচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম গল্পচ্ছলে বলা ঠাকুরের অপূর্ব তত্ত্বকথা সংগ্রহ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে ১৮৭৮ সালের ২৪ জানুয়ারি 'পরমহংসের উক্তি' নামে প্রকাশ করেন, মূল্য ছিল দু-পয়সা। এর বছর ছ'য়েক পর সুরেশচন্দ্র দত্ত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' ১ম ভাগ প্রকাশ করেন। মূল্য ছিল না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, 'সুরেশচন্দ্র দত্ত রামকৃষ্ণের উক্তি নামে একখানি চটি বই বাহির করিলেন, তাহা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত। বইখানি সকলে যত্ন করিয়া পড়িতে লাগিল'।[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে থাকতে তাঁর প্রথম জীবনীটি প্রকাশিত হয় 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায়, তারিখ ১৪ মে ১৮৭৫। লেখার শিরোনাম ছিল 'রামকৃষ্ণ পরমহংস'। এটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম জীবনী। এই লেখার পর পনের বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল ঠাকুরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীটি প্রকাশিত হতে। প্রকাশের তারিখ রথযাত্রা, ১২৯৭ সাল, ইং ৮ জুলাই, ১৮৯০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০। লেখক সেবক রামচন্দ্র দত্ত।

রামচন্দ্র দত্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ধ পাগলভক্ত বলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মহানাম প্রচারে রামচন্দ্রের ভূমিকা ছিল প্রধান। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাই মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নাম এখন জগতে অনেক স্থানেই পরিচিত..., যেসকল ব্যক্তি প্রথম অবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র দত্ত একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।... তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ও শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, আজীবন তাঁহার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দর্শাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নাম, ভাব ও কার্য জগতে প্রচার করিবার জন্য সর্বপ্রথমে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।'

এই উদ্যোগ তখন অনেকেই ভালভাবে নেননি। রামচন্দ্রের মনে প্রাণে বিশ্বাস ছিল, ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী প্রচার করলে সংসারী মানুষের মঙ্গল হবে। তাই তিনি বাণীগুলি লেখার জন্য কলকাতা থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের অমৃতকথাগুলি লিখে নিতেন। একদিন ঠাকুর রামকে বলেন, 'রাম, তুমি এত করছ কেন? এরপর দেখো, তোমার মনই তোমার গুরু হবে।' ঠাকুরের এই ইঙ্গিতকে আশীর্বাদ মনে করে ওই সময় তিনি লেখা বন্ধ করে দিলেও ১৮৮৫ সালের মে মাসে (বৈশাখ ১২৯২) ঠাকুরের উপদেশ প্রচারের জন্য 'তত্ত্বসার' (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৯) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিছু ভক্ত এই কাজে শুধু বাধাই দিলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অভিযোগও করলেন। ঠাকুর গোপনে রামচন্দ্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ গা, এরা সব বলছিল তুমি কি ছাপছ! তাতে কি লিখেছ'?

রামচন্দ্র বললেন, তিনি শ্রীমুখের উপদেশই মুদ্রিত করেছেন। বইয়ের বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন, সাধু বাক্যপ্রচার করাই তত্ত্বসারের সার উদ্দেশ্য। ... যাঁহার তত্ত্বকথা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছা হইবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিলেই সিদ্ধমনোরথ হইবেন। একদা তিনি ভাবাবেগে বলিয়াছিলেন, 'যে কেহ সরল বিশ্বাসে, বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য, ঈশ্বরপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ে আসিবে, তাহার সে বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

ঠাকুর শুনে কোনও আপত্তি করলেন না, তবে সাবধান করে বলে দিলেন, রামচন্দ্রের কোনও কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকলে এতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। নিরহঙ্কারভাবেই ওই কাজ করতে হবে। এছাড়াও ঠাকুর বললেন, 'দেখ, এখন আমার জীবনী ছেপ না, আমার জীবনী বের

করলে শরীর থাকবে না।'

ঠাকুরের এই নিষেধের কারণে ঠাকুর দেহে থাকতে কোনও জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছিল শুধু বাণীগুলি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর রামচন্দ্র দত্ত শুরু করলেন ঠাকুরের জীবনী লেখা। কিন্তু অনেকেই তা মেনে নিতে পারলেন না। শুধু মানা নয়, ত্যাগী ভক্তগণের পক্ষে নরেন বলে পাঠালেন, তাঁর নাম যেন ব্যবহার করা না হয়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময়ের কথায় জানিয়েছেন, 'রামদাদা পরমহংসমশাইয়ের জীবনী লিখতে আরম্ভ করলেন। পরমহংসমশাইয়ের জীবনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা, ইহা হইল প্রথম। একদিন সকালে বলরামবাবু ও আমি রামদাদার বাড়িতে যাইলাম.... রামদাদা তক্তাপোশের উপর একটি তাকিয়াতে বুক রাখিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া কি লিখিতেছিলেন। ...রামদাদা বলরামবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, বলরাম, তাঁর জীবনী একটা লিখছি। .... রামদাদা যে পরমহংসমশাইয়ের জীবনী লিখিতেছেন, সে কথা অনেকেই জানিত এবং পশ্চিমে নরেন্দ্রনাথ ইত্যাদির কাছে সে সংবাদ গিয়াছিল। .... নরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা বরানগর মঠে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, রামদাদার বইতে যেন তাঁহাদের কারও নাম না থাকে। বলরামবাবু সকলের পক্ষ হইতে এই কথা বলিবার জন্য রামদাদার বাড়িতে গিয়াছিলেন। বলরামবাবু বলিলেন, 'রাম, নরেনরা বলে পাঠিয়েছে যে, তোমার বইতে যেন তাদের নাম না থাকে; কারণ, তারা নাম জাহির করতে চায় না।' রামদাদা ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ গুম হইয়া রহিলেন এবং পরে বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে। এইজন্য রামদাদার বইতে সকলের নামের উল্লেখ নাই'।[৩]

শুধু ত্যাগী ভক্তগণ নয়, বলরামবাবু, সুরেশ মিত্র সহ অনেকেই জীবনী রচনাকে ভালভাবে গ্রহণ করেননি। মহেন্দ্রবাবু তাই বলেছেন, 'বলরামবাবু হাসিতে হাসিতে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিলেন। তিনি পথে আসিতে আসিতে অনেক ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাম করছে কি? এসব করলে লোকে হাসবে। তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করা এক কথা আর রাম কি সব কথা বলছে। আমরা দু'জনে হেদোর উত্তর কোণ পর্যন্ত একসঙ্গে যাইলাম। ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম যে, বইতে নাম দেওয়া ও পরমহংসমশাইয়ের কথা জনসাধারণের কাছে প্রচার করা বলরামবাবুরও পছন্দ নয়। সুরেশ মিত্তিরও অনেক ঠাট্টা-তামাশা করিতেন, রাম কী গোঁড়ামি করছে, ও নতুন কী সব কথা বলছে। ইহাই হইল তখনকার অনেকের মনের ভাব।'

প্রথম চেষ্টায় শতেক বাধা। কিন্তু কেন? কারণ নাকি দুই দত্তের ঝগড়া। এই প্রসঙ্গ-কথাও মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকেই শোনা যাক— 'একদিন সকালবেলা গিরীশবাবুর বৈঠকখানার সামনের ছাদে আমি উপস্থিত ছিলাম। নরেন্দ্রনাথ ছাদের পশ্চিমদিকের গরাদেতে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, ... অতুলবাবু আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, 'ওহে নরেন, তোমার দাদা-নাতিতে ঝগড়া, আমরা এ বিষয়ে কি করবো? আমরা

ঠাকুরের প্রথম জীবনীকার ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত। পরবর্তীকালে এঁর সম্বন্ধেই স্বামীজীর সরল উক্তি ছিল— 'ঠাকুরের জন্য যা করেছি, তা দু'দত্ত (অপর দত্ত নরেন্দ্রনাথ)-ই করেছি।

গৃহী, নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকি। সময়মতো তাঁকে স্মরণ করি, এইমাত্র। ওসব সাধন-ভজনের ঝগড়া নিয়ে আমাদের কোনও দরকার নেই। ও তোমাদের দুই দত্তর ঝগড়া, তোমরা গিয়ে বোঝগে যাও'।[৪]

'দুই দত্ত' আর 'দাদু-নাতি'— এঁরা হলেন রামচন্দ্র দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কি সূত্রে এঁরা দাদু-নাতি তা বুঝতে নীচের বংশতালিকায় চোখ বোলাতে হবে।

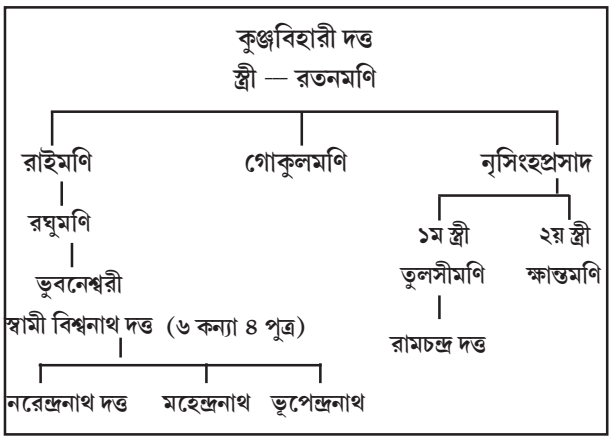

রামচন্দ্র দত্তের কথায় মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকট দ্বারহাটা বা দোরহাট... গ্রামের দরিদ্র পরিবারে কুঞ্জবিহারী দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ... কলিকাতায় আসিয়া বালক কুঞ্জবিহারী নারকেলডাঙ্গায় বাস করিতে লাগিলেন। কুঞ্জবিহারীর বড়ো মেয়ে রাইমণি, ছোটো মেয়ে গোকুলমণি, ছেলে নৃসিংহপ্রসাদ। .. ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যে নৃসিংহপ্রসাদের পৈত্রিক বাড়ি ও বিষয়াদি সব নষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে তিনি রামচন্দ্রকে লইয়া শিমলায় আমাদের তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে আসিয়া বাস করেন। আমাদের বাড়িতে তিনি অল্পকালের জন্য ছিলেন। ... রামচন্দ্র কিন্তু আমাদের বাড়িতেই বাস করিতে লাগিলেন। ... রামচন্দ্রের অল্প বয়সে মা মারা যাওয়ায় আমার মা তাঁহাকে বড়ো ছেলের মতো মানুষ করিয়াছিলেন। ... রামচন্দ্র আমার মা-র মাই খাইয়া মানুষ হইয়াছিলেন। এইজন্য রামচন্দ্রকে আমরা বড়ো ভাইয়ের মতোই জানিতাম'।[৫]

এই রামচন্দ্র দত্তই একদিন নরেনকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে এক অন্য ইতিহাস : '১৮৮০ খৃস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের আত্মীয় রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে বিসূচিকা হইয়া তিনটি ছোট মেয়ে মারা যায়। রামচন্দ্র অধীর হইয়া পড়িলেন, শুনিলেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে জনৈক সাধু আছেন, তাঁহার কাছে যাইলে শান্তি পাইবেন। রামচন্দ্র মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথের তখন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি বিশেষ আস্থা, বিগ্রহ পূজা মানিত না এবং সাধু ও অপর সম্প্রদায় ভ্রান্ত, অনেকটা এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু প্রাণটা সরল, কোনও উচ্চ জিনিস অনুসন্ধান করিতেছিল।

রামচন্দ্র একদিন নরেন্দ্রনাথকে বলিল, 'দেখ্ দক্ষিণেশ্বরে একটি সাধু আছে, সে বড় সুন্দর, কথাবার্তা তার বড় মিষ্টি, চ-না দেখে আসবি।' নরেন্দ্রনাথ আপত্তি তুলিল, 'সে যে ঠাকুর পূজা করে, ভাল হবে কেমন করে?' রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে রসগোল্লা খাওয়াইবে এই লোভ দেখাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে রাজি করিল। সম্ভবত ১৮৮০—৮১ খৃস্টাব্দে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়'।[৬]

'১৮৮৫ খৃস্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম অসুখ হইল। শ্যামপুকুরে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আনা হয়। এই সময়েই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) একেবারে গৃহত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পীড়া উপশম না হওয়ায় কাশীপুরের মতিঝিলের সম্মুখের বাগানটি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে রাখা হইল ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। এই সময় হইতে নরেন্দ্রনাথের প্রকৃত সাধু জীবন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করা এবং কঠোর তপস্যা করা এই স্থান হইতে শুরু হইল।... এইখানে তিনি ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ), সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ), রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ), অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ), অভেদানন্দ (কালী মহারাজ), গোপাল ঘোষ (হুট্‌কো গোপাল), অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল), ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা মহারাজ), যোগানন্দ (যোগেন মহারাজ) ও শিবানন্দ (তারক মহারাজ) প্রভৃতিকে লইয়া একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘ সংগঠন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ) করিয়া রীতিমত তপস্যা শুরু করিলেন'।[৭]

ত্যাগী ভক্তগণ কাশীপুরে উদ্যানবাটিতে থেকে ঠাকুরের সেবা করতে থাকেন। 'রামচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, কালীপদ, বলরাম, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ কাশীপুর বাগানবাটীর ব্যয় বহন করতেন। ঠাকুরের আদেশে সুরেন্দ্রনাথ বাড়ী ভাড়া দিতেন ও বলরাম ঠাকুরের পথ্য খরচ দিতেন। বাকী খরচের ব্যবস্থার জন্য গৃহী ভক্তগণ গিরীশচন্দ্র বা রামচন্দ্রের বাড়ীতে প্রতিমাসে আলোচনা করে চাঁদার পরিমাণ ঠিক করতেন।' বাগানবাড়ীর পরিচালনার ব্যাপারে রামচন্দ্র নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন'।[৮]

দিন দিন খরচ বেড়ে যাচ্ছে, তাই খরচের হিসেব রাখার কথা ওঠে। এই নিয়ে ত্যাগী ভক্তদের নেতা নরেনের সঙ্গে গৃহী ভক্তদের নেতা রামচন্দ্রের মনকষাকষি শুরু হয়।

'উদ্যানেতে ব্যয়াধিক্য, দেখিয়া গৃহীরা।
একত্তরে পরামর্শ করে যোগ্য যাঁরা।।
রামচন্দ্র কালীপদ সুরেন্দ্র এ তিনে।
বলিলেন সেবাপর কুমারের গণে।।
করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পায়।
হিসাব রাখিতে হবে তুলিয়াখাতায়'।।[৯]

ওই সময়ের প্রসঙ্গ কথায় লাটু মহারাজ বলেছেন, 'একদিন টাকা-পয়সার হিসেব রাখা নিয়ে কথা উঠল। লোরেনভাই বললে, এত হিসেব রাখারাখি কেন? এখানে কেউ তো চুরি করতে আসেনি। বাকী হাম্‌নে বললুম, তবু একটা হিসেব রাখা ভালো। হামার কথা রাখাল ভাই মেনে নিলো। গোপাল দাদার ওপোর হিসেব রাখার ভার পড়লো'।[১০]

ঠাকুর একদিন ত্যাগী ভক্তদের বললেন, ‘দ্যাখ, গেরস্তদের বুকের রক্ত এই পয়সা, অপব্যয় করিসনি। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই সকলে আসে।’

ত্যাগী সেবকদের আন্তরিক চেষ্টার পরও খরচ বেড়েই চলে, তাই রামচন্দ্র দত্ত ব্যয় কমানোর জন্য দুটি প্রস্তাব দেন— এক, ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার জন্য দু-তিন জন সেবকই যথেষ্ট। দুই, অন্য সেবকরা যে যার বাড়ি চলে যাবে এবং সুবিধামত কাশীপুরে এসে কাজকর্ম করবে।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয়। ক্ষুব্ধ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সব কথা জানান, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করে বলেন,

‘নরেন্দ্র দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল্ আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়।।
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমনি থাকিব।।
নরেন্দ্র বলেন স্কন্ধে তোমায় লইয়া।
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া’।।[১১]

ঠাকুরের সমর্থন পেয়ে ত্যাগী সেবকগণ ঠিক করেন, ভিক্ষে করে তাঁরা খরচ চালাবেন আর গৃহীভক্তদের এখানে প্রবেশ করতে দেবেন না।

‘গৃহীগণে দরশনে আসিতে না দিব।
লাঠিশোঠা লয়ে দ্বারে প্রহরী থাকিব।।’

তখন ‘বাগানবাড়ীর আবহাওয়া গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মতসংঘর্ষের ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন।’ ত্যাগী ভক্তগণ দৃঢ়ভাব প্রদর্শন করলেন—

‘দ্বিতলে যাইতে আর নাহি দেন কারে।
দরশনে আসে যারা সবে যায় ফিরে।।
ক্রমান্বয়ে তিন দিন ফিরিল সুরেন্দ্র।
কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্দ্র।।’

ঠাকুরের কাছে যেতে না পারার যন্ত্রণায় সকলে ছট্‌ফট করছেন—

‘রাম ও সুরেন্দ্রের দুয়ে বিষাদিত মন।
সুরেন্দ্র নির্জনে করে অশ্রু বিসর্জন।।
গম্ভীরাত্মা রামচন্দ্র ভিতরে গুমরে।
মনোদুঃখ সহসা প্রকাশ নাহি করে।।’

এই অবস্থায় ‘রামবাবু একদিন কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে যেতে চাইলেন। নিরঞ্জনভাই তাঁকে যেতে দিল না। তখন তিনি হামার হাতে কুছু মিষ্টি আর মালা দিয়ে বললেন, ওরে! এগুলো ওপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে। এমন করে বলতে শুনে হামার মনে বড় দুঃখ হলো। হামি তো নিরঞ্জনভাইকে বললুম, ওনাকে উপরে যেতে দাও না, ভাই। আপনা-আপনি মধ্যে এসব নিয়ম কি জারি করতে আছে?’ হামার কথা নিরঞ্জনভাই তখন কানে তুললে না। হামনে তাই বললুম, ‘শ্যামপুকুরে সেদিন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলো, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে আর আজ এনার মতো লোককে ছাড়তে চাইছো না!’ নিরঞ্জনভাইয়ের তখন কি মনে হলো, রামবাবুকে বললে, আপনি উপরে যান।’

লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে; সেইরকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মনোমালিন্য ঠাকুর নিজে ডেকে মিটিয়ে দেন—

‘ডাকাইল উভয়ে আপন সন্নিধান।
সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন পরস্পর।।’

এই ঘটনা প্রসঙ্গে সেবক বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল জানিয়েছেন--- ‘গৃহী ভক্তরা ঘাত-প্রতিঘাতমধ্যে আপন ভাব বজায় রাখিয়া যুগপৎ ধর্মচিন্তা এবং সংসার ও সমাজসেবা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন। সুতরাং কুমারগণকে এই কল্যাণমার্গ দিয়া আনয়ন না করিলে তাঁদের ত্যাগ ও নির্ভরতা পূর্ণ বিকাশ হইবে না এবং সংসারী সন্তানগণেরও তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে না। বোধহয় ইহা ভাবিয়াই ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী ও গৃহী সন্তানমধ্যে কিছুদিনের জন্য যেন একটা ঝটিকা সৃজন করিলেন।’ ঠাকুরের কাছে ‘গৃহী সন্ন্যাসীতে দুয়ে সমান আদর/ মধ্যে বাধাইয়া দ্বন্দ্ব করিলা রগড়।’

গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মিলন ঘটিয়ে ঠাকুর দেহ রক্ষা করেন। ১৬ আগষ্ট ১৮৮৬ সালে ‘ধর্মতত্ত্ব’ পত্রিকায় শোক সংবাদটি দেওয়া হয়— ‘...আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে লিখিতেছি যে, পরমযোগী ও ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের ভক্তিভাজন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গতকল্য রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কাশীপুরে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল হইতে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। এইক্ষণ সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। বঙ্গভূমি একটি সাধুরত্ন হারাইল। অদ্য অপরাহ্ন ৫টার সময় বরাহনগরের ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে।’

এই সংবাদে ‘রাত্রি ১০ ঘটিকা’ বলা হয়েছে। আসলে রাত্রি ১টার অব্যবহিত পরে (একটি মতে ১টা ২ মিনিটে, অন্য মতে ১টা ৬ মিনিটে) দেহরক্ষা করেন। বাংলা তারিখ ৩১ শ্রাবণ, ইংরেজি মতে, ১৬ আগষ্টই হয়। লাটু মহারাজ বলেছেন, ‘তাঁর অস্থি আর ভস্ম

একটা কলসিতে পুরে শশীভাই মাথায় করে (কাশীপুর) বাগানে এনেছিল। যে বিছানায় তিনি শুতেন সেইখানে কলসিটা রেখে দেওয়া হলো।'

ঠাকুরের অস্থি কলস নিয়েও তৈরি হলো জটিলতা। ঠাকুরের গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তগণ মিলিত হয়ে পরামর্শ করে ঠিক করেন, ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে ভাগীরথী নদীতীরে একখণ্ড জমি কিনে সেখানে এই কলস সমাহিত করে একটি মন্দির করা হবে। রামচন্দ্র, মনোমোহন ও হরমোহন তিনজনে বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নাগর, বাঁশবেড়ে এবং ওদিকে মণিরামপুর পর্যন্ত একখণ্ড জমি খুঁজতে থাকেন। কোথাও পছন্দমত জায়গা পাওয়া গেল না। মহিমা চক্রবর্তী কাঠা দশেক জমি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনিও পরে হাত গুটিয়ে নেন। এর মধ্যে চার-পাঁচদিন অতিক্রান্ত হল। কোনও উপায় না দেখে ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রস্তাব দেন, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূতাস্থি সমাহিত করা হোক।

ত্যাগী ভক্তগণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। স্বামী অভেদানন্দ এই প্রসঙ্গে 'আমার জীবন কথা'য় (পৃঃ ১২৩-২৪) লিখেছেন, 'তিনি (রামচন্দ্র দত্ত) শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি তাঁহার যোগোদ্যানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইয়া সেই রাত্রি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রি অধিক হইল... আমরা সকলে স্থির করিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির বেশি অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কৌটাতে রাখিয়া ওই কৌটা বাগবাজারে ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হউক এবং রামবাবু যেন ঘুণাক্ষরেও সেই কথা কোনওরকমে জানিতে না পারেন। পরে রামবাবু আসিলে বাকী অস্থি কলসীসহ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। আমাদের সিদ্ধান্ত মতো তাহাই করা হইল। ... তাহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিল, 'দ্যাখো, আমাদের শরীরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসো আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু করে খাই ও পবিত্র হই।' নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কলসী হইতে সামান্য অস্থির গুঁড়া ভস্ম গ্রহণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া ভক্ষণ করিল। তারপর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলাম।' সেই অস্থি-কলস বেলুড় মঠে পূজা হয়।

অস্থি-কলস রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছির বাগানে রাখা হলো। 'সুলভ সমাচার' ও 'কুশদহ' পত্রিকায় ২৭ আগষ্ট, ১৮৮৬ তারিখে সাংবাদিক জানিয়ে দিলেন, 'আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে অবিকল লিখিলাম।

গত সোমবার (২৩ আগষ্ট, ১৮৮৬) প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া স্ট্রীটের ১৩ নম্বর ভবন হইতে সঙ্কীর্তন সহ অনেকগুলো ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থিপূর্ণ তাম্র কলস লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন ... সিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছির ৮০ সংখ্যক উদ্যানে পঁহুছিয়া একটি ইষ্টকনির্মিত সমাধিগহ্বরে কলসটি রাখিয়া পুষ্প অর্পণ পূর্বক অনেকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, উদ্যানটি পত্রপুষ্প ও সামিয়ানায় সুশোভিত করা হইয়াছিল।'

এর পরের ঘটনায় 'নরেন্দ্রনাথ কাঁকুড়গাছি হইতে ফিরিয়া গিয়া আবার সকল যুবক গুরুভাইকে লইয়া কাশীপুরের বাগানে রহিলেন। টাকা নাই, আহারের কোনও বন্দোবস্ত নাই, কি করিয়াই বা দশ-বারোটি লোক একসঙ্গে থাকে।'

ত্যাগী ভক্তদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকার পথে বাঁধা পড়ার উপক্রম। কারণ, '১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যাঁহারা অর্থ দিয়া কাশীপুরের ব্যয় চালাইতেন, তাঁহারা সকলেই অর্থদানে অনিচ্ছুক হইলেন। বাড়িভাড়া তখন প্রায় দুই বা তিন মাসের অগ্রিম দেওয়া ছিল। এজন্য বাড়িটি রহিল। কিন্তু আহারের বা অন্য কোনও প্রকারের বন্দোবস্ত কিছুই ছিল না। রামচন্দ্র দত্ত বলিলেন, 'যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া যাউক এবং নিজ নিজ কর্ম করুক।' সুরেশচন্দ্র মিত্র কহিলেন যে, তিনি তাঁহার অফিসে হুট্‌কো গোপালের চাকরি করিয়া দিবেন— 'নরেন বাড়ি গিয়া ফের আইন পড়ুক, শরৎ, শশী ও রাখাল— ইহারা যে যাহার বাড়ি যাউক'।[১২]

দাদু রামচন্দ্রের কথায় নাতি 'নরেন্দ্রনাথ সিংহ-বিক্রমে নিজের শক্তি বিকাশ করিতে লাগিলেন।' এই সময়ের কথায় রামচন্দ্র মহেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন, 'দেখলুম যে তাঁর অস্থি কোনও স্থানে সমাহিত করা নিতান্ত আবশ্যক ও স্মৃতিস্বরূপ সেখানে একটা মন্দির করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তখন তো কারও কোনও স্থান ছিল না, কারও বাড়িতে অস্থি রাখাও উচিত নয়। এসব ভেবে আমি সকলকে বললুম, কাঁকুড়গাছিতে আমার যে একটু জায়গা আছে, তাতে অস্থি রাখলে, আর তার ওপরে একটা মন্দির করে দিলে কাজ চলতে পারে। পরে আর কি করা হবে বিবেচনা করা যাবে। আমি এই ভেবেই কথা বলেছিলুম, কিন্তু বিলে (নরেন) আর রাখাল অন্য মত করলে। তারা জেদ করলে যে স্বতন্ত্র একটা মঠ করবে, যেখানে অস্থি রাখবে। তারা স্বতন্ত্র একটা সন্ন্যাসীমণ্ডলী করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জেদ করতে লাগল। তাদের প্রধান কথা হল, এরকম আদর্শপুরুষকে দেখে কি গৃহে ফিরে যাব। যদি গৃহেই ফিরে যাব, তবে এই আদর্শপুরুষের কাছে এসে থাকবার কি আবশ্যক ছিল।' নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীভক্তগণ 'দশ টাকা দিয়া (বরানগর) পরামাণিক ঘাটে মুন্সীদের ভুতুড়ে বাড়িটি ভাড়া করা হইল। মুটের পয়সার অভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শয্যাদি হুট্‌কো গোপাল অনেকটা স্বীয় স্কন্ধে করিয়াই বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন'।[১৩]

দুই দত্ত দু'ভাগ হয়ে গেল। 'গৃহী ভক্তেরা যথা গিরীশবাবু, কালীপদ (এম্‌ব্লেম) প্রভৃতি কাঁকুড়গাছিতেই বেশি সংলগ্ন হইলেন। সুরেশ চন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টারমশাই) ইঁহারা বরাহনগর মঠের পক্ষাবলম্বী রহিলেন।' রামচন্দ্র দত্ত কাঁকুড়গাছিতে আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত বরানগর মঠের পরিচালনার দায়িত্বে থাকলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নামক ভক্তিগঙ্গা গৃহী ও ত্যাগী এই দুটি ধারায় প্রবাহিত হলো। সাধন-ধারাও হলো দুটি।

'নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্তেবাসীদের ভাব হইল ; গুরুকে আদর্শ করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে হইবে, কঠোর তপস্যা না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না। যেমন করিয়া হউক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে জীবনে কিছুই হইবে না।

বরানগর মঠের সকলের ভিতর তখন প্রবলভাব ছিল— কঠোর তপস্যা করিবে, জগৎ হইতে একেবারে লুকাইয়া থাকিবে, কাহারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিবে না, জগৎ যেন নিবিয়া গিয়াছে। জগৎ হইতে এমনভাবে ও এমন স্থানে লুকাইবে যে, জগতের কোনও কিছুর শব্দ বা গন্ধ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছিতে না পারে। কেবল ভগবানের চিন্তা ও জপধ্যান লইয়া থাকিবে। দেহ ধারণের মতন কিঞ্চিত আহার করিবে। কখনও কখনও দুইজনে একসঙ্গে থাকিত; কিন্তু পাছে সসঙ্গ ভাব আসে, এইজন্য অনেক সময়ই একাকী থাকিত। এইরূপ প্রবল নিঃসঙ্গ ও নিরালম্ব ভাব হইয়াছিল'।[১৫]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত দুটি ধারার বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করেছেন, তাই একদিকে নরেন্দ্রনাথের সাধন-দর্শন-এর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাধন-দর্শন দু'ভাগেই তিনি দেখে লিখেছেন— 'রামদাদা বলিলেন, 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। যখন তাঁকে দর্শন করেছি, তখন আর সাধন-ভজনের কোনও আবশ্যক নেই। ... সুজ্জি দর্শন করলে কেউ কি সুজ্জির ফটো ঘরে তুলে রেখে সেটিকে সুজ্জি বলে মনে করে? তাঁর বিষয় চিন্তা করা, তাঁর নাম করা, তাঁর প্রসঙ্গ— এ হলেই যথেষ্ট। কঠোর তপস্যা করার দরকার নেই। সে সব সমস্তই তিনি করে গেছেন। .... সমস্ত শাস্ত্রের যা সারাংশ, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন, তারও ঊর্ধে তিনি। তাঁর বাণী হলো শাস্ত্র, অপর শাস্ত্রের আবশ্যক নেই। কঠোর তপস্যার আবশ্যক নেই। কারণ এ সমস্ত করে তিনি পূর্ণ অবস্থায় এসেছেন। তিনি হলেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। সব পথ তিনি দেখেছেন। সব পথ দিয়ে চলে তিনি পূর্ণ অবস্থায় এসেছেন।

তাঁর নাম, তাঁর ধাম, তাঁর প্রিয় পরিচিত জন, তাঁর পদরেণুরঞ্জিত দেবস্থানসমূহ, তাঁর শ্রীঅঙ্গপরশিত দ্রব্য সকল, তাঁর স্মৃতি জড়িত সকল কিছুই আমার নিকট অতীব পবিত্র। কারণ এসকলই যে আমার বল্লভের'।[১৬]

ভক্তিগঙ্গার দুটি ধারা কিন্তু গিয়ে মিলল 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক মহাসমুদ্রে। দুই দত্তের দুটি পরিচালন-ধারা সমানভাবে প্রবাহিত হয়েছিল বলে পাশাপাশি কেউ মিশে যেতে চায়নি। তাই ঠাকুরের প্রথম জীবনী রচনার সময় নরেন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'রামদাদার বইতে যেন তাঁদের নাম না থাকে।' সে কারণেই ঠাকুরের প্রথম জীবনীটিতে আমরা অনেক কিছুই পাইনি।

সেবক রামচন্দ্র দত্ত লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থটি ১২৯৭ সালের রথযাত্রায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনেক আগেই এটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। গ্রন্থসূচনায় সেই কথায় রামচন্দ্র লিখেছেন, 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত লিখিব বলিয়া বহুদিন হইতে বাসনা ছিল। অনুমান ছয় বৎসর অতীত হইল, একখানি ক্ষুদ্রাকার জীবনী লিখিতও হইয়াছিল, কিন্তু ছাপা হয় নাই। সেই জীবনীখানি কাশীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়া কাশী হইতে ছাপাইবার মানসে গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কিন্তু বলিতে পারি না কি কারণে তাহা ছাপা হয় নাই। দুই বৎসর পরে সেই পাণ্ডুলিপি পুনরায় ফিরাইয়া লওয়া হয়। এতাবৎকাল তাহা তদবস্থাতেই ছিল। সম্প্রতি বরিজহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে আমরা এই গুরুতর কার্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কৃতকার্য হওয়া ভগবানের ইচ্ছা।'

কাঁকুড়গাছি ও বরানগর দুটি আলাদা ধারা হলেও পরবর্তীকালে সকলে সকলের অনুষ্ঠানে যেতেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাই বলেছেন, 'নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই রামচন্দ্র দত্তের সহিত মাঝে মাঝে দেখা করিয়া আসিতেন এবং যে রকম সম্মান করা উচিত সেইরূপ সম্মান করিতেন। সদ্ভাব খুবই ছিল, তবে আশ্রম দুটি ভিন্ন হইয়াছিল— কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান ও বরাহনগর মঠ, এবং দুজনাদের সাধনপ্রণালীও বিভিন্ন ছিল।'

কেন এমনটি হয়েছিল? এর উত্তরে স্বামীজী একবার বলেছিলেন, 'যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, তা গৃহস্থই হোক আর সন্ন্যাসীই হোন— তাঁদের ভেতর দল-ফল নেই, থাকতে পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন-আপন বুদ্ধির রঙে রাঙিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে একরকম রঙিন কাঁচ চোখে সেই এক সূর্যকে নানা রঙ-বিশিষ্ট বলে দেখেছি'।[১৭]

রামচন্দ্র দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত দাদু-নাতি। এই দুই দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার-যজ্ঞের দুই প্রধান পুরোহিত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন— 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গকালে মনে স্ফূর্তি থাকিলে নরেন্দ্রনাথ কখনও কখনও কৌতুক করিয়া বলিতেন, তোরা আর কি করেছিস? যা করেছি, আমরা দু'দত্ত করেছি।' — এই কথাটি খাঁটি সোনার মতো সত্যি।

তথ্যসূত্র :—

১. স্বরাজ পত্রিকা, ১০ চৈত্র, ১৩১৩ সন। ২. গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান — মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৬১। ৩. তদেব, পৃঃ ৬১। ৪. তদেব, পৃঃ ৫৯। ৫. তদেব, পৃঃ ৫। ৬. শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫) – মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ৭. তদেব, পৃঃ ১৯। ৮. শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, পৃঃ ১৯৫। ৯. শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৬১৮। ১০. শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৮৬। ১১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৬১৯। ১২. গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃঃ ৩২-৩৩। ১৩. শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২। ১৪. তদেব, পৃঃ ১২৭। ১৫. গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃঃ ৫০। ১৬. তদেব, পৃঃ ৫৪। ১৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১১।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিপ্লব চেয়েছিলেন

সঞ্জয় ভুঁইয়া

ধর্ম কি জিনিস মুখে বলে বোঝানো যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। আমাদের এই হাইটেক দুনিয়ায় প্রবেশ করা মানুষদের নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমরা ধর্মকে অনুভব করতে চাই না, শুধু তার তত্ত্বগত দিকটা মানুষকে বোঝাতে চাই।

অথচ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ভক্তদের কতরকম ছোট ছোট সুন্দর উদাহরণ দিতেন। যেমন সেই কুসুরে পোকার গল্প। বলতেন কুসুরে পোকাকে ভাবতে ভাবতে আরশোলা কুসুরে পোকা হয়ে যায়। ধর, একটা বড় শক্তিসম্পন্ন জীব তার থেকে কম শক্তিসম্পন্ন একটা জীবকে ধরে বেঁধে তার ডেরায় নিয়েগেল। তারপর দীর্ঘদিন ধরে গর্তের মুখে তালাবন্ধ। ফলে কী হল? তার আচার-আচরণ-স্বভাব সবই পরিবর্তন হয়ে গিয়ে সেও ওই জীবের মতো পরিণতি লাভ করল।

ঠিক এই ঘটনাই ঘটে একজন ঈশ্বরভক্ত মানুষের জীবনে। ঈশ্বর লাভকেই যখন কেউ জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মেনে নেয়, তখন আমরা দেখি, তার জীবনে অবধারিত ভাবে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করে। চাল-চলন, হাব-ভাব, কথাবার্তা সব দিক দিয়ে। শেষটা যেটা দাঁড়ায় সেটা হল তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের বিলোপ (অর্থাৎ ক্ষুদ্র অহংবোধের বিলুপ্তি)। আর ভগবানের সঙ্গে একীকরণ। এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যে একটা খুব সুন্দর প্রচলিত কথা ব্যবহৃত হয়— 'ইউনিফিকেশন উইথ দ্য ডেইটি' বা জীবাত্মার সঙ্গে পরম্পরার মিলন। এখানে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটা হল, ভেতরে ভেতরে মানুষের এই চরম রূপান্তর। মানুষটা হয়ত চলছে, ফিরছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জন্ম নিচ্ছে অন্য মানুষ, নতুন মানুষ।

আমরা তো আজকাল প্রায়ই রাষ্ট্রের বিপ্লব নিয়ে বড় বড় কথা বলে থাকি, জাতির বিপ্লব যখন ইতিহাসের চাকা উল্টে দেয়, তখন আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে যখন নৈতিকতার সারাৎসার নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে মানুষটাকে সমাজের পঙ্কিল আবর্জনা থেকে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় ছিঠকে দেয়, বলতে হবে সেটাই হচ্ছে যথার্থ বিপ্লব। আর ধর্মে'র কাজ হল এই বিপ্লব ঘটানো।

এবার দেখা যাক কী হয় এই বিপ্লব ঘটলে। স্বামীজী বলছেন এক জায়গায়, 'ফ্রম ব্রুট ম্যান টু বুদ্ধ ম্যান'। এ প্রকারান্তে ঠাকুরেরই কথা। মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে দেবত্বের স্তরে উঠে যায়। মানুষ নিজেই দেবতা হয়ে যায়। হৃদয়টা সমুদ্রের মতো মহান হয়, আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ধর্ম খেলা করে।

'অফ দ্য ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট' গ্রন্থে ব্যাপারটা বোঝানো হচ্ছে এইভাবে, 'হ্যাপি ইজ দ্য সোল দ্যাট হার্ত দ্য লর্ড স্পিকিং উইদিন হার অ্যাণ্ড রিসিভেত ফ্রম হিজ মাউথ দ্য ওয়ার্ড অফ কমফোর্ট'। অর্থাৎ মানুষ সত্যের সন্ধান পায়। সেই যথার্থ সত্য, যথার্থ আলো, যথার্থ প্রেম, বাইরের দিকের, বাইরের জগতের যে নশ্বর সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা মানুষকে উন্মাদ করে, হতাশ করে তার থেকে সে মুক্তি পায়। এই যে একের সঙ্গে অন্যের মিশে যাওয়া, একের মধ্যে অন্যের হারিয়ে যাওয়া এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আপনার আমার জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবনে ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল হয়ে থাকবে, ততক্ষণ অবধি একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ থাকবেই। এই সংঘর্ষ চলতেই থাকবে থামবে না। আজ যে আমরা দেখছি, খুব দ্রুত পরিবার ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে, মানুষের মন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ কী? কারণ, আর কিছুই নয়, ঠাকুরের ভাষায় ওই কাঁচা আমিদের সংঘাত। আর ধর্মে স্থিত হলে ওই 'কাঁচা আমিই' রূপান্তরিত হবে 'পাকা আমিতে'। ফলে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হবে, তার অহংবোধের অপমৃত্যু ঘটবে এবং একের বিরুদ্ধে অন্যের হাতিয়ার ওঠানোর আর অন্য কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয়, একমাত্র এই অবস্থাতেই পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি আনয়ন করা সম্ভব। একমাত্র সেই অবস্থাতেই পরস্পরের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। কারণ, মানুষ এখন তো আর সাধারণ মানুষ থাকছে না। আমরা পাচ্ছি একটা পরিপ্লাবিত মানুষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ, আপ্তকাম মানুষ।

এবার দেখুন, আজকের দিনে আমরা যাকে 'সিভিল সোসাইটি' বলি, যার পরিকাঠামো নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই, তার দিকে তাকালেই ব্যবহারিক জগতের সবকিছুই আপনি পূর্ণমাত্রায় পাবেন। ভোগের প্রাচুর্য, নতুন নতুন প্রযুক্তি, সাম্প্রতিক অর্থনীতির গালভরা সব তথ্য, কী নেই সেখানে? কিন্তু সবক'টা শর্তের একীকরণ সত্ত্বেও মানুষে মানুষে উত্তরণ নেই, মনে মনে সাম্য নেই। 'রিপাবলিকান' গ্রন্থে প্লেটো সমাজ-শৃঙ্খলা ও স্বধর্ম পালনের সঙ্গে সমন্বয় সূত্র আবিষ্কার করার পরে তার অতীতও যে

কিছু আছে এটা মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই তত্ত্বকে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মে অনেক আগে থেকেই পরীক্ষিত সত্যের আকারে মানুষের মধ্যে প্রচার করে এসেছে। তাই আমাদের দৃষ্টিতে ধর্ম শুধুই কিছু নিয়মনীতি, আচার-বিচার মিশ্রিত সামাজিকতা নয়, এটি হল মানুষের ভেতর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, অনুভব, তৃপ্তি, রূপান্তর। তার জন্য শুধু প্রয়োজন আপনার, আমার সবার ধর্ম নামক সেই বিশাল ছাদের তলায় এসে দাঁড়ানো।

এই যুগে পৃথিবীতে বাঁচতে এসে আমাদের মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে আমরা পেয়ে গেছি সনাতন ধর্মের আধুনিকতম প্রচারক ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে যিনি স্বয়ং ঈশ্বরকেও তাঁর উপলব্ধ সত্যটুকু উপহার দিতে পারেননি। বলেছেন সত্য হল কলির তপস্যা, আর অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয়ত, ধ্যান করবে কোথায়? না মনে, বনে আর কোণে। তুমি যে ধার্মিক হচ্ছ, উদার হচ্ছ, সত্যের দিকে হাঁটছ এটা ঢাক পিটিয়ে লোককে বলার কিছু নেই। তোমার আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র আস্তে আস্তে ওই কুসুরে পোকার মতো হয়ে গিয়ে তোমাকে একটা যথার্থ পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে। তখন তোমার হাতেই সমাজ নতুন করে জন্ম নেবে। তুমি মানুষকে ধর্ম দেবে, আর 'মেটেরিয়ালিজম্' নিয়ে ঘাঁটা প্রত্যেক যুগের নব্যবাহরা তোমার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে কী বলল চাই না বলল, সে সম্বন্ধে তোমার অত চিন্তা করার কিছু নেই। ওদের সম্বন্ধে আমি কি বলে আসছি মনে আছে তো? 'ওরা লোক নয়, ওরা পোক'— ওদের মধ্যে বিপ্লব নেই! ❖

নিজেকে বেশী চতুর মনে করা উচিত নয়— যেমন কাক খুব চতুর, কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে, তেমনি সংসারক্ষেত্রে যারা বেশী চালাকি করতে যায় তারাই কেবল ঠকে থাকে।

ঠাকুরের দুই সাধিকা

নবকুমার ভট্টাচার্য

ভগবান যুগ প্রয়োজনে জাগতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর সাধনার সহায়ক রূপে তিনি যোগ্য পাত্রকেও ধরাধামে আনয়ন করেন। তাঁরা ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করলেও যথাসময়ে তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর অন্তরঙ্গ, কেউ বা বহিরঙ্গ, কেউবা তাঁর রসদ্‌দার, কেউ বা তাঁর সাধিকা। তাঁরা তাঁর লীলাপুষ্টির সহায়কও হন। পরে ভগবান স্থূলদেহ ত্যাগ করলে তাঁরা তাঁর আরব্ধ লোককল্যাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করে কাজ শেষ হলে যথাসময়ে স্ব-স্ব ধামে গমন করেন। ঠাকুরের দুই ভক্ত সাধিকা সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বহু গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের অভ্যুদয় হইবে। গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতি সেই মহীয়সীদিগেরই অগ্রবর্তিনী। শ্রীশ্রীযোগীন মা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী'। যোগেন আমার জয়া আমার সখী, সহচরী, সাথী। আবার বলতেন 'যোগেন, গোলাপ— এরা কত ধ্যান জপ্ করেছে, সেসব আলোচনা করা ভাল। এতে কল্যাণ হবে।' যোগীন মা-র পূর্ব নাম ছিল যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস। পিতা প্রসন্ন মিত্র ছিলেন সেকালের নামকরা ডাক্তার। ১৮৫১ সালের ১৬ জানুয়ারি ৫৯/১, বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে যোগীন মা'র জন্ম। তিনি পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় কন্যা। যোগীন মা'র বিবাহ হয় খড়দহের অম্বিকাচরণ বিশ্বাসের সঙ্গে। বিবাহের পর একটি শিশুপুত্র হয়ে মারা যায়। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে একমাত্র শিশু কন্যাকে নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। মেয়ের নাম ছিল 'গনু'। কথামৃতে তাঁকে 'গনুর মা' বলা হয়েছে (৩/১৯/১-২)।

শ্রীঠাকুরের একান্ত অনুরাগী বলরাম বসু ছিলেন যোগীন মা'র মামাশ্বশুর। তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলরামবাবু জানতেন। ঠাকুর একদিন বলরাম বসুর বাড়ীতে এলে তিনি যোগীন্দ্রমোহিনীকে ডাকিয়ে এনে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। প্রথম দর্শনে কিন্তু তিনি হতাশ হলেন। কারণ, ঠাকুর তখন ভগবদ্ প্রেমে বিভোর আর মাতালের মতো টলছিলেন। যোগীন্দ্রমোহিনীর স্মৃতিতে ভেসে উঠল তাঁর উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ স্বামীর চিত্র। তিনি ঠাকুরকেও মাতাল ভেবে বলরামবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু নিজের অজান্তেই যোগীন্দ্রমোহিনী যেন যেদিন ঠাকুরের চরণে বাঁধা পড়ে গেলেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ হল তাঁর। প্রথম দর্শনে ঠাকুরের প্রতি তাঁর যে বিরূপ মনোভাবের উদয় হয়েছিল তা দূরীভূত হতে দেরি হল না। পরিবর্তে সৃষ্টি হল এক ভক্তিরসের ফল্গুধারা। তিনি ঘনিষ্ঠ হলেন মা সারদাদেবীর সঙ্গেও। মা সারদামণি তাঁকে আদর করে বলতেন, 'যোগেন' বা 'মেয়ে যোগেন'। একসময় যোগীন মা'র মনে রামকৃষ্ণদেবের তুলনায় মা সারদামণিকে ঘোর সংসারী মনে হয়েছিল। একদিন গঙ্গাতীরে যোগীন মা'র জপের সময় রামকৃষ্ণদেব তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে গঙ্গায় ভাসমান অপবিত্র বস্ত্র দেখিয়ে বললেন, 'এর দ্বারা যেমন গঙ্গা অপবিত্র হয় না, ঠিক সেরূপ গঙ্গার মতো সারদামণি চিরপবিত্র এবং তিনি ও রামকৃষ্ণদেব এক ও অভিন্ন।'

যোগীন মা'র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করাটাকে তাঁর ভাই হীরালালের ভাল লাগত না। ঠাকুরও যোগীন মা'র ৫১/১, বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে আসতেন। একদিন ঠাকুর যখন যোগীন মা'র বাড়িতে এসেছিলেন তখন তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য হীরালাল বাগবাজারে গোঁসাইপাড়ার বিখ্যাত মল্লবীর ও ব্যায়ামপটু মন্মথকে এনেছিলেন। কিন্তু কোথায় মন্মথ তাঁকে ভয় দেখাবেন— শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে ও তাঁর মুখামৃত পানে মন্মথ অন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। দণ্ডবৎ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন— 'প্রভু আমি বড় অপরাধী, আমায় ক্ষমা করুন।' তিনি মন্মথকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে বললেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে মন্মথের পরিচয় ছিল। মন্মথ অখণ্ডানন্দজীকে অনুরোধ করলেন, দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে। তাঁর কথামতো অখণ্ডানন্দজী ও মন্মথ ঘোড়ার গাড়ী করে এক মালসা নবীন ময়রার রসগোল্লা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। পূর্বে মন্মথ শখের থিয়েটারে ডাকাত সাজতেন। যখন সেজেগুজে স্টেজের ওপরে হুঙ্কার দিতেন, দর্শকরা রীতিমতো চমকে যেত। তদানীন্তন কালের ধনী কীর্তি মিত্রের একমাত্র পুত্রের নায়েব ছিলেন মন্মথ। আচার বিচারের ধার ধারতেন না। খাদ্যাখাদ্য, বিচার মানতেন না, পৈতে টৈতে সব বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু এই গুণ্ডা মন্মথ শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ কৃপায় অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় পৈতে ধারণ করলেন। ঠাকুর তাঁকে কৃপাও করেছিলেন। এই মন্মথও যোগীন মা'কে খুব মান্যি করতেন। আর করবেন নাই বা কেন! যোগেন মা ধ্যান করতে বসলে তাঁর শরীরবোধ থাকত না। এমন হতো যে, ওই সময় তাঁর চোখের কোণে মাছি, গায়ে মশা বসে থাকলেও তিনি টের পেতেন না। বৈরী পূজার্চনায় তাঁর খুব নিষ্ঠা ছিল। কঠোরতা, ব্রত উপবাসও তিনি খুব করতেন।

শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'যোগেন খুব তপস্বিনী— এখনও কত ব্রত উপবাস করে।' জপ ধ্যানাদিতে তিনি এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন

যে, শেষ অসুখের সময়ে যখন তাঁর উঠে বসবার ক্ষমতাও ছিল না, তখন তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে হতো নিয়মিত জপাদির জন্য। ওই অবস্থাতেও তিনি 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'ভাগবত' প্রভৃটি পাঠ শুনতেন। যোগেন মা তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে কৌলমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে তিনি স্বামী সারদানন্দের কাছে বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি গেরুয়া পরিধান করতেন কেবলমাত্র পুজোর কালে। অন্য সময়ে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন। ঠাকুর এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ও কুঁড়িফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে। ও যে সহস্রদল পদ্ম। ধীরে ধীরে ফুটবে।' ঠাকুরের এই মহাবাণী যোগেন মা'র জীবনে বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যোগেন মায়ের সম্পর্ক ছিল একেবারেই সহজ সরল। বাগবাজারে এসে কখনও যোগেন মাকে দেখলে হয়তো বলতেন, আজ তোমার হাতে দুটি খাবো। পুঁইশাক চচ্চড়ি রাঁধো। যোগেন মা যখন কাশীতে ছিলেন, স্বামীজী কখনও

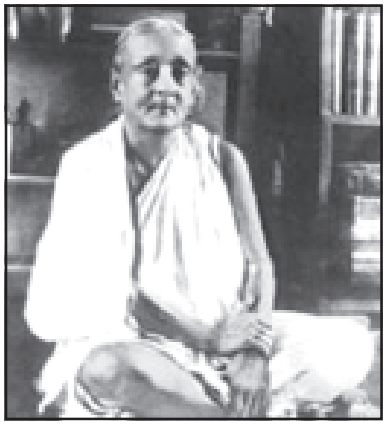

যোগীন মা

সেখনে গিয়ে বলতেন, 'আজ তোমার বিশ্বনাথ এসেছে গো, যত্ন-আত্তি করো।' একবার বৃন্দাবনে লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যার পর ধ্যান করতে করতে যোগেন মা গভীর সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় নিজের বাড়ীতেও একবার তাঁর সমাধি হয়। এই ঘটনা জানতে পেরে স্বামীজী বলেন, 'যোগেন মা সমাধিতে যাবে। যার একবার সমাধি হয়, দেহত্যাগের সময় তার সেই স্মৃতি আবার আসে।'

ঠাকুর ১৮৮৬ সালে যখন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁর ইহলীলা সংবরণ করেন, তখন যোগেন মা ছিলেন বৃন্দাবনে। ঠাকুরের লীলা সংবরণের পর মা সারদা যখন বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে উভয়ের মিলন এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। দু'জনেই গভীর শোকে আচ্ছন্ন। একদিন তাঁরা স্বপ্ন দেখলেন, যেন ঠাকুর তাঁদের কাছে এসে বলছেন, 'তোমাদের এত শোকের কী আছে, আমি তো এখানেই আছি। শুধু এক ঘর থেকে আর এক ঘরে।'

একমাত্র কন্যার মৃত্যু, ১৯১৪ সালে বৃদ্ধ মায়ের দেহাবসান এবং ১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের পর তাঁর জীবন শূন্যতায় ভরে গিয়েছিল। মায়ের লীলা সংবরণের ৩ বছর পর ১৯২৩ সালের ১৯ এপ্রিল মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে সারদানন্দজীর সঙ্গে জয়রামবাটীতে যান এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পূজা ও উৎসবাদিতে পরিশ্রমের ফলে তাঁর রুগ্ন শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। অবশেষে ১৯২৪ সালের ৪ জুন বুধবার ঠাকুরের রাত্রিকালীন ভোগরাগাদির পর রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিটের সময়ে বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে' ৭৩ বছর বয়সে মহাসমাধিযোগে তিনি দেহরক্ষা করেন।

ঠাকুরের অপর এক সাধিকা গোলাপ মা। 'কথামৃত' গ্রন্থে যাঁকে 'শোকাতুরা ব্রহ্মণী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মা-বাবা আদর করে ডাকতেন অন্নপূর্ণা। আসল নাম গোলাপ সুন্দরী দেবী। আদি বাড়ী বাঁকুড়া জেলার কতুলপুর হলেও বাবা শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে কলকাতার বাগবাজারেই থাকতেন। ১৮৬৪ সালে তাঁর জন্ম সেখানেই। তখনকার প্রথানুযায়ী অল্প বয়সে বিয়ে হলেও অকাল বৈধব্য তাঁর দাম্পত্য জীবনের সুখকে দীর্ঘায়িত করেনি। এক পুত্র

গোলাপ মা

আর কন্যাকে নিয়ে যখন দুঃখকে ভুলতে চাইলেন, তখন এল আবার আঘাত। প্রাণাধিক পুত্রের অকাল প্রয়াণ। পরমাসুন্দরী কন্যার বিয়ে হল পাথুরিয়াঘাটার জমিদার সঙ্গীত বিশারদ সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু সে কন্যাও বাঁচলেন না। এই সময় তাঁর প্রতিবেশী এবং ঠাকুরের পরম ভক্ত যোগেন মা এই শোকাতুরা মহিলাকে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যান। ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে এবং উপদেশ শুনে গোলাপ মা প্রাণে অনেক শান্তি পান এবং তাঁর নিদারুণ শোকের জ্বালা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ঠাকুর তাঁর নামকরণ করেন 'গোলাপ দিদি'। সেই থেকে তিনি ভক্তমণ্ডলীর কাছে 'গোলাপ মা' নামে পরিচিত। ঠাকুর নানাভাবে উপদেশ দিয়ে তাঁর ব্যথিত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করতেন। ঠাকুর তাঁকে বলতেন, ঈশ্বর অশেষ উপকার করেছেন। তোমার জীবনের শেষ বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে অনন্ত পথের পথিক হবার সুযোগ তোমাকে করে দিয়েছেন। তুমি এ সুযোগ গ্রহণ কর। জন্ম-মৃত্যু সবই ক্ষণস্থায়ী— অনিত্য। একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য এবং সত্য। বৃথা শোক করে সময় নষ্ট করো না। শ্রীশ্রীমাকে বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি তাকে খুব পেট ভরে খেতে দেবে। পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে। আর 'তুমি এই ব্রাহ্মণের

মেয়েটিকে যত্ন করো, এই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।' গোলাপ মা'রা দুই বোন। দুজনেই বিধবা। দরিদ্র ভাইয়ের সংসারে বাস করতেন। গোলাপ মা'র আমন্ত্রণে ঠাকুর সদলবলে ২৮ জুলাই, ১৮৮৫ সালে নবীন সরকার লেনের বাড়ীতে পদার্পণ করলে গোলাপ মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। 'কথামৃত' (৩য় ভাগ) গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ঠাকুর বাগবাজারের একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ী আসিয়াছেন। বাড়ীটি পুরাতন ইষ্টকনির্মিত। বাড়ী প্রবেশ করিয়াই বামদিকে গোয়ালঘর পদার্পণ করলে, গোলাপ মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাতার দিয়া কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া আছেন। সকলেই উৎসুক, কখন ঠাকুরকে দেখিবেন.... ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়া ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। ... ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। পরে ঠাকুরের সান্নিধ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহস্পর্শ পেয়ে ধন্য হলেন। ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ও শ্যামপুকুরে থেকে সর্বতোভাবে মাকে সাহায্য করেছিলেন। ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দীর্ঘ ছত্রিশ বছর তিনি সর্বক্ষণ মায়ের কাছে থেকে অবিচলিত ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করেছেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের দেহাবসানের পর তিনি সর্বদা মাকে চোখে চোখে রাখতেন। কোথাও যেতে হলে মাও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁর সেবায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, 'আমি গোলাপকে সঙ্গে না লয়ে কোথাও যেতে পারি না। গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।' ১৮৮৬ সালে ঠাকুরের সমাধিলাভের পর শোকে মুহ্যমান শ্রীশ্রীমাকে গোলাপ মা-ই সঙ্গে করে উত্তর ভারতের বৃন্দাবন থেকে দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরম্ পর্যন্ত নানা তীর্থ পথ ঘুরিয়ে মনে কিছুটা শান্তির প্রলেপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর সম্বন্ধে বলতেন, 'গোলাপ জপে সিদ্ধ... গোলাপের মন কত শুদ্ধ, কত উঁচু মন। তাই ওর অত শুচি অশুচি বিচার নেই... ওর এই শেষ জন্ম।' গোলাপ মায়ের পবিত্রতা ও নিরভিমানতা দেখে শ্রীমা তাঁর সম্বন্ধে আরও বলতেন, 'অনেক সাধন তপস্যা করলে, পূর্বজন্মের বহু তপস্যা থাকলে এ জন্মে মনটি শুদ্ধ হয়'। ঠাকুরও স্বয়ং তার এই শুদ্ধ মনটির কথা জানতেন। শ্রীমায়ের দেহাবসানের পর যে চার বছর গোলাপ মা বেঁচেছিলেন, সেই সময়ে গোলাপ মা-ই সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের কাছে মায়ের মতন হয়ে তাঁদের সব রকমের সেবায় নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অতিবাহিত করে গেছেন। গরীব প্রতিবেশী কেউ অসুস্থ হলে ডাক্তারকে ডেকে তাদের দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। অপরদিকে নিজে নেহাৎ অপারগ না হলে তিনি কারও সেবা নিতে চাইতেন। না। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। অতিবৃদ্ধ বয়সেও নিত্য গঙ্গাস্নানে যেতেন। স্ত্রীভক্তদের বলেই রেখেছিলেন— যোগেন যাবে শুক্লপক্ষে, আর আমি যাব কৃষ্ণপক্ষে। অবশেষে সেই দিন উপস্থিত হলো। ১৩৩১ সালের ৪ পৌষ কৃষ্ণঅষ্টমীতে বিকাল ৪টায় তিনি মহাপ্রস্থান করেন। ❖

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অভিনয় জগৎ

স্বামী আত্মবোধানন্দ

কৃপাময় শ্রীরামকৃষ্ণের পরমপবিত্র পূত—পেলব পরশে ধন্য হয়েছে বাংলার অভিনয় জগৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয় দেখতে ভালোবাসতেন এবং অভিনয় করতেও জানতেন। তিনি একজন অবতারপুরুষ হয়েও সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা করেছেন এবং সহজ সরল সাধারণের মতো যে লোকায়ত সংস্কৃতি ও সামাজিক জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন, তা তাঁর মতো একজন অবতারপুরুষের কাছে অভিনয়ই বটে। কারণ, অন্যান্য অবতারদের মধ্যে যে রাজৈশ্বর্য প্রত্যক্ষ করা যায়, তা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নিষ্প্রভ, বরং তাঁর এই অনাড়ম্বর জীবনযাপনই তাঁকে করেছে অসাধারণ ও অনন্য।

অভিনয় জগৎকে তৎকালীন সমাজে তির্যক দৃষ্টিতে দেখা হত; এবং যারা নাট্যালয়ে অভিনয় দেখতে যেত তাদেরও রক্ষণশীল সমাজ ভালো চোখে দেখত না। এমতাবস্থায়, শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি সেখানে অন্য এক মাত্রা এনে দেয়; সেই সঙ্গে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সৎসাহিকতার পরিচয় দান করেন নাটককে লোকশিক্ষার বাহক বলে। শুধু তাই নয়, তাঁর পবিত্র পদস্পর্শে রঙ্গালয়ে এক নতুন উন্নত অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ হয়। নট-নটীরা তাঁর স্নেহাশিসে পায় এক স্বস্তির আশ্বাস, পায় তাঁর পরম সাহচর্য, রঙ্গালয় পরিণত হয় জীবন্মুখী শিক্ষালয়ে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনা। তখন স্টার থিয়েটারে গিরিশ ঘোষ রচিত 'চৈতন্যলীলা' নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নাটক দেখতে যাবেন। সঙ্গে আছেন মাস্টারমশাই, বাবুরাম, কালী, মহেন্দ্র মুখুজ্জে ও দুটি ভক্ত। সকল ব্যবস্থা করেছেন গিরীশচন্দ্র। গিরীশ শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত। তাঁর ষোল আনা বিশ্বাস যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণ। তিনি ঠাকুরকে থিয়েটারে নিয়ে যাবেন এবং ঠাকুরও অভিনয় দেখতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন— সেজন্য সবাই আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় এক ভদ্রলোক ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সে কি মশায়, থিয়েটারে যাবেন! সেখানে যে বারবণিতারা অভিনয় করে।' তদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, আমি তাঁদের মা আনন্দময়ীরূপে দেখবো।' তাঁর ব্রহ্মদৃষ্টিতে সব একাকার হয়ে যেত। ভগবান যাবেন ভক্তের অভিনয় দেখতে, এতে আর আশ্চর্য কি! শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে নিন্দুকেরা অবনত, নির্বাক, নিরুত্তর তারা। অবশেষে তিনি গেলেন চৈতন্যলীলা দেখতে। নাটকের নামভূমিকায় ছিলেন তৎকালীন নাট্যমঞ্চের বিখ্যাত নটী বিনোদিনী দাসী। নাট্যালয়ের ম্যানেজার গিরীশ তাঁর জন্য বক্সে বসার বন্দোবস্ত করেছিলেন। নাটক শুরু হলো। নাট্যরসিক শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয় দেখছেন। দেখতে দেখতে ডুবে গেছেন অভিনয়ের মধ্যে। ভাবে কখন আত্মস্থ হয়ে গেছেন, নিজেকে একাকার করে ফেলেছেন নাটকের সঙ্গে। এদিকে বিনোদিনী শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় ডুবে গেছেন, 'হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ' বলে আকুল নয়নে ব্যাকুল হয়ে ধুলায় লুটাচ্ছেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছেন, কখনও সমাধিস্থ আবার কখনও বা সুস্থিত হচ্ছেন। এইভাবে চলছে অভিনয়; কখনও ভক্ত হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যের ভাবে আবেগতাড়িত, আবার কখনও বা ভগবান হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যের ভাবে মাতোয়ারা। ঠাকুরের নয়নে অঝোরে ঝরছে প্রেমাশ্রুধারা। সে এক অপূর্ব অমিয় লীলামাধুরী। ভক্তের লীলাভিনয়ে ভগবান আপ্লুত, অভিভূত।

অভিনয় শেষ হল। এবার প্রণামের পালা। গিরীশ থেকে আরম্ভ করে সকলে একে একে এসে তাঁকে প্রণাম করছেন। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি খুঁজছেন, যে ছেলেটি শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করলো, সেটি কোথায়? ভক্তেরা বলল, 'না মশায়, ও ছেলে নয়, ও যে আমাদের বিনোদিনী।' তখন ঠাকুর বললেন, 'তাই তো বলি, মা না হলে এত ভাব কার?' বিনোদিনী পরমপুরুষের শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন, জানালেন অন্তরের আকুতি, — 'ঠাকুর আমি তো অপবিত্রা, সমাজের চোখে ঘৃণিতা, বারাঙ্গনা নারী; আমার কি হবে ঠাকুর?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, — 'তুই তো আমায় বড্ড ঠকিয়েছিস্, আসল-নকল সব একাকার করে দিয়েছিস্।' পরম স্নেহে মস্তক স্পর্শ করলেন; বলে উঠলেন— 'তোর চৈতন্য হোক মা।' রোমাঞ্চিত হল সর্বাঙ্গ, নটী বিনোদিনীর জীবনে এল এক নব উত্তরণ। তাঁর সুপ্ত চৈতন্যসত্ত্বা জাগরিত হল— নবজন্ম লাভ করল। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে তাঁর জীবনে ঘটে গেল এক মহাবিপ্লব। দেখতে দেখতে তিনি পৌঁছে গেলেন অভিনয় জগতের চরম শিখরে। এই সময় তাঁর অভিনীত ও গিরীশচন্দ্রের রচিত 'প্রহ্লাদ—চরিত্র', 'বৃষকেতু', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নিমাই-সন্ন্যাস' এবং 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রভৃতি নাটক শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন এবং তাঁর যুগান্তকারী অভিনয় নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁকে আশীর্বাদ করেন 'মান-হুঁশ হও' এবং অবহিত করেন— 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ' সম্বন্ধে।

এরপর বিনোদিনীর জন্মান্তর ঘটলো। তাঁর জীবনে ঘটে গেল এক মহাপ্লাবন। দিনে দিনে অধ্যাত্মপথে নিজেকে নিয়োজিত করতে লাগলেন এবং অচিরেই অভিনয় থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত

নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহাশিস পাওয়ার পর তিনি মাত্র বছরখানেক সংযুক্ত ছিলেন অভিনয়ের সঙ্গে। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে অবস্থান করছেন শ্যামপুকুর-বাটীতে। খবর পেয়ে বিনোদিনী ছুটে আসেন ঠাকুরের দর্শন-অভিলাষে। কিন্তু সেখানে সর্বসাধারণের অবাধ দর্শন বন্ধ। কাজেই তাঁকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হল। একদিন সুযোগ বুঝে সাহেবের ছদ্মবেশে, বিশেষ ভক্ত কালীপদ ঘোষের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ঠাকুরের পদকোকনদে উপনীত হলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একধারে চুপ করে। কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ! তিনি তো প্রাণদেবতা, অন্তর্যামী। তিনি

বিনোদিনী

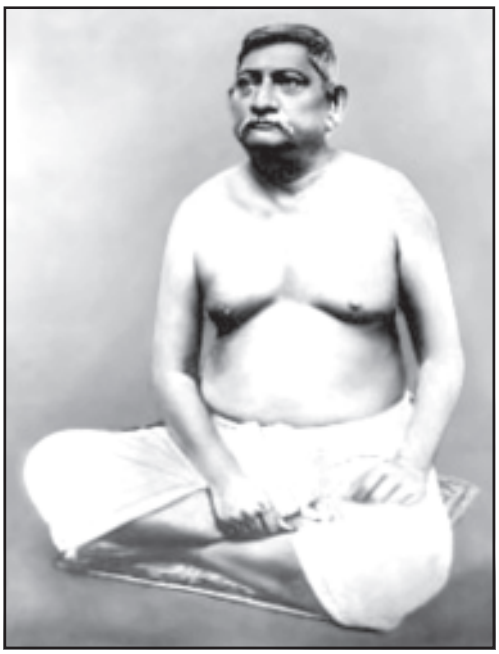

গিরীশ ঘোষ

বললেন, 'তুই এখানে এই সময়ে কি করে এলি গো ?' প্রাণের ঠাকুর ঠিক চিনতে পেরেছেন। যেন তৃষিত হৃদয়ে শীতলবারি সিঞ্চিত হল। হৃদয়-মন-প্রাণ আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী লিখেছেন, ''একদিন আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই, তখনও সেই রোগাক্লান্ত প্রসন্নবদনে আমায় বলিলেন, 'আয় মা বোস।' আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব। এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান।'' (শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চ — নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০৬)।

এরপর থেকে বিনোদিনীর জীবন সম্পূর্ণ অন্য পথে পরিচালিত হয়। তিনি তপস্বিনীর মতো জীবনযাপন শুরু করেন। সারাদিন একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখতেন। কারুর সঙ্গে বড় একটা দেখাশোনা করতেন না। সবসময় পূজা-অর্চনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। নিয়মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও গীতাদি গ্রন্থ পাঠ করতেন। একটি ঠাকুরঘর করে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, শালগ্রামশিলা, গোপাল মূর্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণের পটে ফুল চন্দনাদি দিয়ে পুজো করতেন। ভাগবৎ ভক্তিমতী বিনোদিনী পার্থিব জগৎ থেকে সরে এসে অধ্যাত্মজগতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন বলেই তাঁর জীবনে হতাশা আসেনি। পরন্তু পেরেছিলেন এক অমল অধ্যাত্ম-অনুভূতি, যা তাঁর জীবনকে দিয়েছিল শান্তির সুশীতল ছায়ানীড়। এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ জানিয়েছেন, 'দীর্ঘ ৭৮ বছর জীবিত ছিলেন বিনোদিনী। এই সুদীর্ঘ জীবনে বহু আঘাত এসেছে তাঁর জীবনে। যে মঞ্চের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। সেই মঞ্চ তাঁকে পরিত্যাগ করে আসতে হয়েছে, যে সহৃদয় পুরুষ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, একমাত্র কন্যাটিকেও তাঁর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বিধাতা। চারদিকে অসীম শূন্যতার মধ্যে শান্তির আশ্রয় খুঁজেছেন তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণ) কাছেই, যাঁর কাছে পেয়েছিলেন শান্তির আশ্বাস। ... দৈনিক সন্ধ্যায় আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনতেন। কখনও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তির সম্মুখে বসে আকুল হয়ে কাঁদতেন। বেলুড় মঠেও তাঁর যাতায়াত ছিল।' (সূত্র : শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, পৃষ্ঠা ২০৮)

অভিনয়ের দ্বারাও মানুষ পরমপুরুষার্থ লাভ করতে পারে; বিনোদিনীর জীবনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি তাঁর অভিনয়ের দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মনে দাগ কাটতে পেরেছিলেন বলেই এই পরমপ্রাপ্তি। অভিনয় যেমন মানুষকে ঊর্ধ্বায়ণে সাহায্য করে তেমনি অবরোহণেরও অনুসারী করে তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে নট-নটীদের কৃপা করেছিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়কে করেছেন পবিত্র। এই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আপনজনবোধ

করতেন তাঁকে, তাঁকে হৃদয়াসনে স্থান দিতেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন, ''রঙমহলে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্যের একটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। শৌখিন সম্প্রদায়ের অভিনয় হলেও তাতে কয়েকজন প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ও অভিনেত্রী যোগদান করেছিলেন। সেই সঙ্গে আমরা কয়েকজন অধ্যাপকও ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। অভিনয়-সন্ধ্যায় সকলে যখন সাজপোষাক পরতে ব্যস্ত— আমন্ত্রিত অতিথি সমাগমে প্রেক্ষাগৃহ প্রায় পূর্ণ— অভিনয় আরম্ভ হবার বিশেষ বিলম্ব নেই। কিন্তু তখনও প্রধান অভিনেতা কমল মিত্র মহাশয় এসে পৌঁছাননি। সকলেই উদ্বিগ্ন। নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য কিছু পূর্বে হন্তদন্ত হয়ে কমলবাবু এসে পৌঁছলেন— কিন্তু আমাদের প্রত্যাশামতো তিনি প্রথমেই সাজঘরে না ঢুকে চলে গেলেন উইংসের পাশে। কৌতূহল মন নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, কমলবাবু ধীরে সুস্থে, বেশ ভক্তিভরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে প্রণাম করছেন। প্রণাম সেরে আবার অত্যন্ত দ্রুত সাজঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সাধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম এর কারণ। উনি জানালেন, শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তারপর থেকে পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাঁকে রঙ্গমঞ্চের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রণাম না করে কোনও শিল্পী থিয়েটারের কোনও কাজ করে না।''... (শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, পৃষ্ঠা ৭)। অনুরূপভাবে আপন অনুভূতি থেকে অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, ''তিনি গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তাই তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) মঞ্চের গুরুরূপে গ্রহণ করা হয়।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৪)। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নট-নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের গুরু ছিলেন এবং গিরীশ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে তবে অভিনয় করতেন। সেই হেতু সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী নটগুরু গিরীশচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে থাকেন। তাছাড়া রঙ্গমঞ্চকে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম লোকশিক্ষার বাহন বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সে কারণেই তাঁকে নাট্যালয়ের দেবতা বলা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে নাট্যকার গিরীশচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনের উন্মেষ হয়, এবং তাঁর কৃপায় পরমপ্রাপ্তি ঘটে। তাই গিরীশচন্দ্র বলতেন, ''আমি যে মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করেছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াস সাধ্য; এইভাবেই আমি আচ্ছন্ন— দিবারাত্র আচ্ছন্ন। শয়ন-স্বপনেও এই ভাব — পরম সাহস — পরম আত্মীয় পেয়েছি; সংসারে তো আমার কোনও ভয় নয়। মহাভয় মৃত্যুভয়— তাহাও দূর হয়েছে।'' গিরীশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বহু নাটকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও ভাবধারা প্রচার করেছেন। তিনি যে কোনও বিষয়ে কথা বলার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রয়োগ করতেন এবং তাঁর মধ্যে একটা অপূর্ব ভাব তন্ময়তা প্রত্যক্ষ করা যেত। যারা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেনি, তারা তাঁর এই ভক্ত-ভৈরব গিরীশের মধ্যে দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক আলোকের আনন্দধারায় অভিস্নাত ও অনুপ্রাণিত হত। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত গিরীশচন্দ্রকে একবার অভিনেতা অপরেশবাবু বলেছিলেন, ''মশায় আপনার কৃপায় থিয়েটারগুলির সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত হয়ে পড়েছে।'' একথা শুনে গিরীশবাবু পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে মাথায় ঠেকিয়ে আন্তরিক প্রণাম নিবেদন করলেন। বললেন, ''সে তো আমার সৌভাগ্য! তিনি কৃপাময়, তাঁর করুণা সকলে উপর।''

সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীরপুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্য দিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে করে ভগবানের পানে চেয়ে থাকে।

অভিনয় এমনই একটা মাধ্যম যার দ্বারা মানুষ খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষা অর্জন করতে পারে— 'তা সুশিক্ষা হোক বা কুশিক্ষা, যাই হোক না কেন, তা মানুষকে মুগ্ধ করবেই। অভিনয়-কৌশলের দ্বারা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হয়। ফলে মানুষ তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, অভিভূত হয়। একবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় 'নীলদর্পণ' নাটক দেখতে গেছেন। অভিনয় দেখতে দেখতে একাত্ম হয়ে তিনি এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটালেন। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন, তাঁর মতো একজন প্রজ্ঞাদীপ্ত বিদ্বান ব্যক্তির ব্যবহারে। বিদ্যাসাগর মশায় এক অত্যাচারী অভিনেতার অভিনয়কে এত প্রত্যক্ষ সত্য বলে মনে করলেন যে, অভিনয় চলাকালীন নাট্যমঞ্চেই তাকে লক্ষ্য করে নিজের পায়ের চটিজুতো খুলে ছুঁড়ে মারলেন। অভিনয় মানুষকে কতটা মুগ্ধ করতে পারে তা বিদ্যাসাগর মশায়ের এই আচরণই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অভিনয় ক্ষণেকের হলেও মানবমনকে অন্য স্তরে পৌঁছে দেয়।

এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণা করে 'সীতারাম'-এর এক অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাঁর দাদা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় খুব সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং কোথাও কোনও অসত্য আচরণ দেখলেই প্রতিবাদ জানাতেন। তিনি একবার দেখছেন,

অভিনয়ে রাণী কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা হতে দিচ্ছেন না। আবার তাঁকে বনবাসে পাঠাবার জন্য দাবি জানাচ্ছেন। একি মিথ্যাচার, বলে সেই যাত্রাভিনয়ের মধ্যেই প্রদীপ নিয়ে 'পাপীয়সী' বলে কৈকেয়ী-সাজা লোকটির মুখ পুড়িয়ে দিতে উদ্যত হলেন। তখন দর্শক লোকেরা তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তবে থামায়, যে এটা অভিনয়, সত্য নয়। অভিনয়ের মধ্যে মানবমন ডুবে গেলে এরকম হয়, এবং এতে খুব তাড়াতাড়ি উদ্দীপন হয়। তাই দেখা যায়, দুঃখের কোনও অভিনয় থাকলে দর্শকদের অশ্রুভরা নয়ন ছল ছল করে। কিন্তু তাঁরা জানেন, এসব মিথ্যা, তথাপি অভিনয়ের শৈল্পিক নৈপুণ্যে আকৃষ্ট হয়ে যেতে হয়। সাময়িক হলেও মানবমনে তা একটা ছাপ ফেলে।

পরিশেষে বলা যায়, এই জগৎ সংসার একটা অভিনয়ক্ষেত্র। এখানে লীলাখেলা চলে নিরন্তর। মনুষ্যলীলায় অভিনয় অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে। জগৎমঞ্চে মানুষের আগমন অভিনয়ের জন্য। কখনও পিতা পুত্ররূপে অভিনয় করছে। আবার কখনও বা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বণিতা, কন্যা প্রভৃতি রূপে বিশ্বসংসারে লীলাকার্য সম্পন্ন করছে। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিনয়কে সত্য বোধ হতে পারে। এমনকি এই বিভিন্নরূপের অভিনয়কে যুক্তিশীল মানুষেরা অভিনয় বলে অস্বীকার করতে পারেন। কারণ, জাগতিক নিয়মের অধীনস্থ এই অভিনয়। কিন্তু, বেদান্তদর্শন সহায়ে সূক্ষ্মবিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মনুষ্যলীলা অভিনয় ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কারণ, অদ্বৈতবেদান্ত বলে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' কাজেই জগৎ যখন মিথ্যা-মায়ায় পরিপূর্ণ, তখন তাকে অভিনয়ক্ষেত্রই বলা হবে। আর যা কিছু অসত্য, তা-ই অস্থায়ী। তদ্রূপ অভিনয়ও ক্ষণিকের জন্য, তাই তা অসত্য, অনিত্য। আবার এই জগৎমঞ্চও মিথ্যা, তার উপর আরোপিত অভিনয়ও মিথ্যা।

কিন্তু এই দুই মিথ্যায় মিলেমিশে যে চরিত্র-চিত্র চিত্রায়িত করা হচ্ছে তা সত্যে পর্যবসিত হচ্ছে। এ যেন গাণিতিক সূত্রে বিয়োগে বিয়োগে যোগ (x -=+) হচ্ছে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ যে চারিত্রটি ফুটিয়ে তোলে তা তথাকথিত সামাজিক জনজীবনে অল্পবিস্তর রেখাপাত করে এবং মানুষের মনমুকুরে তা দাগ কাটে। কাজেই অভিনয় মিথ্যা হলেও তার মধ্যে যে সুপ্ত ভাবটি লুক্কায়িত থাকে তা আপাতত সত্য বলে স্বীকার করে নিতেই হয়। আমরা জানি তা মিথ্যা, কিন্তু তাৎক্ষণিক সত্য দৃষ্ট হয়। একটা ভাব আরোপিত হয়, তৎদ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। বোধকরি, সেই জন্যই লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশচন্দ্রকে বলেছিলেন, —'গিরিশ! নাটক ছেড়ো না, ওতে লোকশিক্ষা হয়।' ❖

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় সঙ্গীত

অমিতাভ গুহঠাকুরতা

তোমারি নাম বলব নানা ছলে
বলব একা বসে আপন মনের
ছায়াতলে...

তোমার কথাই বলব বলে আপন মনের নিভৃত একটি কোণায় আসন বিছিয়ে বসে আছি, অপেক্ষায়। যে আলো দিয়েছ তারই প্রভায় চেয়ে চেয়ে দেখি বারবার, ফিরে ফিরে দেখি তোমার আনন্দ-অমৃতময় জীবনরূপ। যা কথায়-গানে, ভাবে-বিভাবে, মূর্তে-অমূর্তে, হাসিতে-কান্নায়, ভাষায়-ইঙ্গিতে, মাধুর্যে-অভিনবত্বে বিশ্বমানবকে দিয়েছে আশ্চর্যরত্নের সন্ধান। ঠিক এরকম গভীর দ্যোতনায় কেউ কি জানে, কবে কোন তথাকথিত অশিক্ষিত মহাপুরুষ আ-চণ্ডাল মানব-সমাজের হৃদয়হরণ করেছেন? কেউ কোনওদিন শোনেনি, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একদিকে শাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, সহজতম উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহ। অন্যদিকে ভাবের উচ্ছ্বাসে নৃত্য করতে করতে গান গেয়ে চলেছেন। কোন সে গান? সে গানের ভিতর দিয়ে নিজের অভিপ্রায়িক তত্ত্বকে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন ভক্ত-হৃদয়ের মর্মস্থলে। প্রকৃত সত্য, প্রকৃত তত্ত্বের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে প্রায়ান্ধকার ভক্তহৃদয়। চিদাকাশে সুনীল মহিমা। গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি।

বিখ্যাত দার্শনিক Herbert Spencer-এর "Origin and Function of music প্রবন্ধটির আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— '....স্পেনসরের মতকে আর এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন আসিতেছে যখন আমরা সঙ্গীতেই কথাবার্তা কহিব।... যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে, পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অণুভাবসকল অসংকোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব— তখন অণুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সঙ্গীতই আমাদের অণুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে।' রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি যে সময়কার, সে সময় ঠাকুরের সঙ্গেও ব্রাহ্ম সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ঠাকুরের কাছেও কি এ তত্ত্ব পৌঁছেছিল অথবা তাঁর একান্ত নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস ছিল যে, ভাবের উদয়ের সঙ্গেই ভাববিষয়ক সঙ্গীতের প্রকাশ হয়। তাই যখনই কোনও গভীর তত্ত্বকথার আলোচনা হোত, তখনই সেই বিষয়ক কোনও সঙ্গীত পরিবেশনের সাহায্যে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিতেন। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। যে বিষয় একবার শুনতেন তা কখনও ভুলতেন না। শৈশবকাল থেকেই ঠাকুরের বিচিত্রমুখী উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার লিখেছেন, — 'তাহার ন্যায় পাঠ ও ধর্মতত্ত্ব সকলের ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে সক্ষম ছিল না। সঙ্কীর্তনকালে তাহার ন্যায় ভাবোন্মত্ততা, তাহার ন্যায় নূতন নতুন ভাবপূর্ণ আখর দিবার শক্তি এবং তাহার ন্যায় মধুর কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য আর কাহারও ছিল না। আবার রঙ্গপরিহাসস্থলে তাহার ন্যায় সঙ দিতে, তাহার ন্যায় নরনারীর সকল প্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে এবং তাহার ন্যায় নূতন নূতন গল্প ও গান যথাস্থলে অপূর্বভাবে লাগাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হইত না।'

জীবনীকার রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন — 'তাঁর বোধশক্তি এত প্রবল ছিল যে, যখন যে বিষয় শ্রবণ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার অভ্যাস হইয়া যাইত। এইরূপে যাত্রা, কীর্তন, চণ্ডীর গীত ও নানাবিধ সঙ্গীতাদি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠও অতি মধুর ছিল।' ঠাকুরের সঙ্গীত প্রতিভার কথা সমসাময়িক জীবনী লেখকেরা সবাই স-প্রশংস উল্লেখ করেছেন। শ্রীশ্রীমাও কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর) যেন, মধুভরা, গানের ওপর যেন ভাসতেন। সে গানে কান ভরে আছে!'

সঙ্গীতপ্রবণ ঠাকুরের 'প্রিয় গান' বলতে সাধারণভাবে আমরা তাঁর স্বকণ্ঠে গীত এবং অন্য কণ্ঠে গীত অথবা তাঁর কথা প্রসঙ্গে অন্য যে সব গানের উল্লেখ হয়েছে, এমন সমস্ত গানের কথাই বুঝব। এপর্যন্ত সংগৃহীত ৩৫২টি সঙ্গীতের মধ্যে ২৪৭টি গান 'কথামৃত' থেকে পাওয়া যাবে, গানের পটভূমিকাসহ। একই গান ঠাকুর গাইতেন, ঠাকুরের শিষ্যরাও গাইতেন। আবার ব্রাহ্মসমাজের গায়কদের কণ্ঠেও গীত হয়েছে। এই বিপুল সংগ্রহ থেকে কয়েকটি মাত্র গানের উল্লেখই করব। যেমন— বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন, সেদিন ঠাকুরের অনুরোধে যে গানটি তাঁকে শুনিয়েছিলেন, সেটি একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত, রচয়িতা : অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, রাগ: সুরট—মল্লার, তাল – একতাল।

মন চল নিজ নিকেতনে!
সংসার– বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন
পর-প্রেমে কেন হয় অচেতন, ভুলিছ আপন জনে?
সত্যপথে মন কর আরোহন, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ—
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোক্ষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম
পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ, সে পান্থনিবাসী গণে।
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।।

সেইদিনকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ঠাকুর শ্রীমুখে বলেছেন... ''পশ্চিমের (গঙ্গার) দিকের দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই। বাহিরের কোনও পদার্থেই ইতর সাধারণের মতো একটা আঁট নাই। সবই যে তার আলগা.... গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে দুই চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল...'

রামকৃষ্ণদেব ছিলেন সার্থক লোকশিক্ষক। শিল্পের প্রতিটি ধারাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। শৈশবে তিনি গ্রামের কুমোরপাড়ায় প্রতিমার মুখমণ্ডল আঁকতেন নিপুণ হাতে। কোনওরকম প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই অসাধারণ মেধাশক্তির সাহায্যে যে কোনও শ্রুত সঙ্গীতকে পুনঃরূপায়ণ করতে পারতেন। এমনকি নাটক বিষয়ে চরিত্র অভিনয় করে গিরীশ ঘোষকে পর্যন্ত হতবাক করে দিয়েছিলেন। জীবনে অনেক সঙ্গীত শুনিয়েছেন ভক্তমণ্ডলীতে। যখনই যে তত্ত্বের অবতারণা হয়েছে, তখনই শুধুমাত্র শ্রুতি থেকে গান শুনিয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে নিজে কখনও শিক্ষকতা করেননি। শুধুমাত্র একবারই প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দকে একটি গান গলায় গলায় শিখিয়েছেন— গানটির রাগ : ভৈরবী, তাল: একতাল—

মা ত্বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা,
আমি জানি গো ও দীন-দয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।।
তুমি জলে, তুমি স্থলে,
তুমিই আদ্যমূলে গো মা।
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে—
সাকার, আকার, নিরাকারা।।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা।।

নরেন্দ্রনাথের (বিবেকানন্দ) তখন খুবই আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন চলছে। একদিন তাঁর মনে হল, ঠাকুরের কথা যখন মা শোনেন, তবে তাঁকে গিয়ে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বললে তিনি নিশ্চয়ই মা-কে বলে একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে 'ভবতারিণী' মা-এর কাছে পাঠালেন। কিন্তু তিনবারের চেষ্টাতেও তিনি অভীষ্ট কথা মাকে বলতে পারেননি, বললেন, 'মা বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।' শেষে ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা যা, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কোনওদিন হবে না।' সেইদিন ঠাকুর ভবতারিণী মন্দিরে গিয়ে মা–র কাছে এই গানটি গেয়েছিলেন বারবার। আড়াল থেকে নরেন্দ্রনাথ সব শুনে, ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন গানটি শিখিয়ে দিতে।

এ ঘটনাটি সম্পর্কে 'লীলা-প্রসঙ্গ'-তে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে

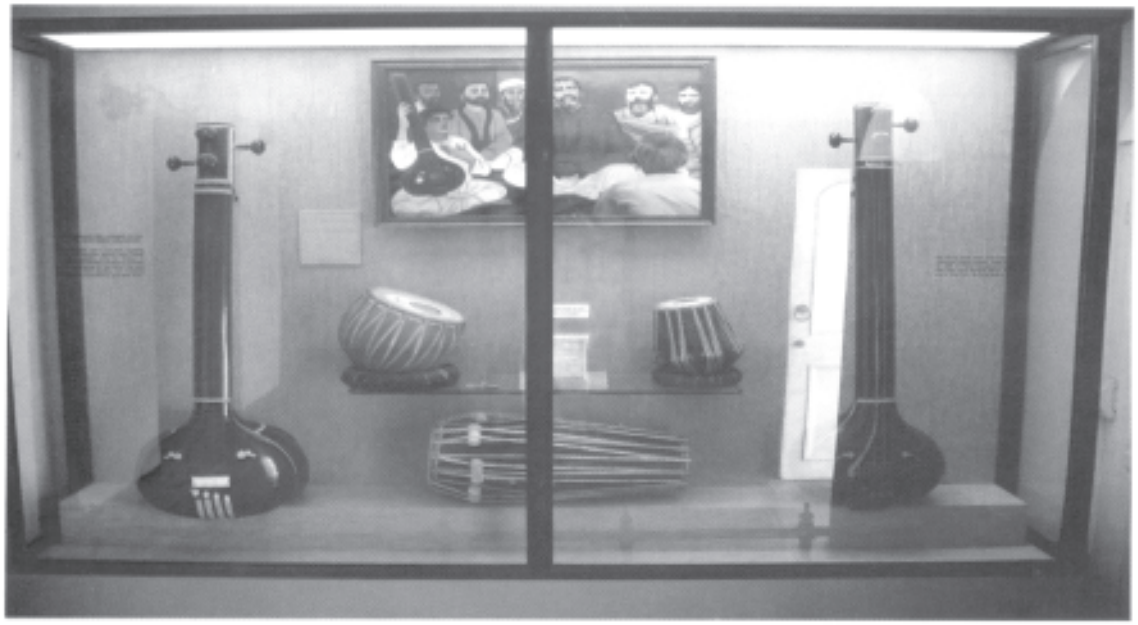

স্বামীজীর জন্মভিটের প্রদর্শনীশালায় সঙ্গীতমোদী নরেন্দ্রনাথের অনুসারী সঙ্গীতের কিছু সরঞ্জাম ও গায়ক নরেন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরের একটি অঙ্কিত চিত্র।

দেখিয়ে বলেছেন, ...''ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মা-কে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে, তাই মা-র কাছে টাকাকড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পারলে না— বলে লজ্জা করলে! মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে মা-র গান শিখিয়ে দাও— 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ওই গানটি গেয়েছে। তাই এখন ঘুমুচ্ছে (আহ্লাদে হাসিতে হসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে— না?''

এবারের গানটির রচয়িতা : রামপ্রসাদ যেন, তাল : একতাল। এই গানটির শেষ লাইনটিতে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে, 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না' অংশটিকে ঠাকুর বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন, মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে—

কে জানে মন কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতোন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কে বা জানে তেমন।।
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুতরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন।।

ঠাকুরের তখন অসুস্থ অবস্থা। তাঁর কণ্ঠরোগের চিকিৎসা করছেন সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার। 'শ্যামপুকুরে' একটি বাড়িতে প্রায়শঃই এসে ঠাকুরকে দেখে যেতেন ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ এই মহেন্দ্রলাল। তখনকার সময়ের একজন ব্যস্ত মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা ঠাকুরের কাছে থাকতেন এবং তত্ত্ব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। একদিন এইরকম আলোচন চলছে যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের অনেক কিছুই মানুষের বুদ্ধিসীমার অতীত। তাই ঠাকুর বলেছেন, ''ঈশ্বরের 'ইতি' যারা করে তারা হীনবুদ্ধি, তাদের কথা সহ্য করতে পারি না।''

এপ্রসঙ্গে লীলা-প্রসঙ্গ রচয়িতা সাক্ষ্য দিচ্ছেন— ''এই বলিয়া ঠাকুর জনৈক ভক্তকে শ্রীরামপ্রসাদের এই গানটি গাইতে বললেন এবং শুনিতে শুনতে উহার ভাবার্থ মৃদুস্বরে ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। 'আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন' গানের এই অংশটি গাহিবার কালে ঠাকুর গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, 'উঁ হুঁ, উল্টোপাল্টা হচ্ছে, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না এইরূপ হইবে। মন তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানতে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে ধরা তার কর্ম নয়। প্রাণ কিন্তু ওই কথা বুঝিতে চাহে না, সে কেবলই বলে, কি করে আমি তাঁকে পাব।' ডাক্তার ওই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ, মন ব্যাটা ছোট লোক, একটুতেই পারব না, হবে না বলে বসে। কিন্তু প্রাণ ওই কথায় সায় দেয় না বলেই তো যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে।''

জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকার ভেতর জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধকের মনের ভেতর যেন সংসারভাব না থাকে।

ঠাকুর দাশরথি রায়ের পাঁচালি গান খুব পছন্দ করতেন। 'এ কি বিকার শঙ্করী', 'দোষ কারো নয় গো মা' প্রভৃতি। এসব গানের গভীর কথা ও ভাব শুনে ঠাকুর রামলালকে বলতেন, ''আহা! কি গান ও ভাব, ভাবই আসল জিনিস। কুলোর যেমন স্বভাব খারাপটি ফেলে ভালোগুলি কোলের দিকে টানে। কি জান বুঝদার হওয়া চাই, ভাব চাই। 'ভাবিলে ভাবের উদয় হয় যেমন ভাব তেমনই লাভ মূল সে প্রত্যয় এই বলে ঠাকুর গান ধরলেন—

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালী পদ সুধা হ্রদে, চিত্ত ডুবে রয়
(যদি চিত্ত ডুবে রয়)

তবে, জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়। — প্রসাদী, একতাল

রামপ্রসাদী, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, পদাবলী-কীর্তন, যাত্রা-থিয়েটারের গান বিশেষত গিরিশ ঘোষের 'চৈতন্য-লীলা'র বেশ কিছু গান ছাড়াও তখনকার ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল। একবার আলমবাজারের বিখ্যাত পাঁচালি গায়ক শিব আচার্যের গাওয়া 'এমন অমূল্য ও শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কানে' গানটি দক্ষিণেশ্বরে বসে শুনে ঠাকুর বলেন, ''আহা, তুমি কত লোককে গান শুনাচ্ছ, ৪-৫ ঘন্টা একভাবে গাইছ, তোমার গলা খারাপ হয় না, এ কি কম কথা। যার দ্বারা দশজন আনন্দ পায় তার হৃদয়ে যেন ঈশ্বরের শক্তি বিরাজ করছে।''

ঠাকুরের ভক্তবৃন্দরা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, তাঁদের ঠাকুর সুমিষ্ট কণ্ঠে 'মায়ের

গান' শোনাতেন একের পর এক। কখনও তাঁদের কণ্ঠেও শুনতেন। কিন্তু যখন কেউ থাকত না, তখন ঠাকুরের কাছে থাকতেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভাইপো। তিনি আবার সাত চড়েও গান গাইতে পারেন না। তাই সঙ্গীত-পিপাসু ঠাকুর মা-র কাছে প্রার্থনা জানালেন, ''মা, যদি রামের গলাটা খুলিয়া দিস তো বড় ভালো হয়।'' তাঁর আবেদনে মা সাড়া দেন এবং রামলাল অলৌকিকভাবে গান গাইবার শক্তি লাভ করেন। একদিন ঠাকুরের শয়নকক্ষের পূর্বদিকের বারান্দায় বসে কাকার আদেশ ও নির্দেশ মতো ভাইপো গান ধরলেন—

দেখবে চল রাণি! শিবের স্বর্ণকাশী,
কাশীর কথা কি একমুখে প্রকাশি
শতমুখে কওয়া ভার,
জামাই আর নাই ভিখারী।

গান শুনে ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। রামলালকে বললেন, 'যা তোর খুড়িকে ডেকে নিয়ে আয়।' অসময়ে হঠাৎ ডাক পড়েছে শুনে শ্রীশ্রীমা তো অবাক। তখন ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমায় ডেকেছি কেন জানো? রাম গান গাইবে। তুমি শুনবে। তাই ডেকেছি।' ঠাকুরের কথা শুনে দ্বিগুণ বিস্ময়ে শ্রীশ্রীমা বললেন, 'সে কি! রাম গান গাইবে! ওর মুখ দিয়ে যে 'রা' বেরোয় না। ও কি করে গান গাইবে? ঠাকুর সে কথা শুনে বললেন, 'না গো না, ও কথা ভেবোনি। মা-কে বলে সব ঠিক করে দিয়েছি।'

এই গানটির রচয়িতার নাম এখনও অজ্ঞাত। তবে এই গানটি যে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গানটির একটি পাঠান্তর—

ওহে শিখরী জামাই নাই ভিখারী।
এখন শিবের স্বর্ণপুরী।
সে যে রত্নময়ী কাশী (দেখে এলাম)
তাতে উমাশশী
অন্নপূর্ণা নাম রাজরাজেশ্বরী।।
শিবের সাধের কাশীধাম, কেবল মোক্ষধাম
পূর্বদিকে গঙ্গা সুরেশ্বরী।।
কিবা রত্নকাশী, কাশীর উপমা নাই তার ত্রিজগতে
কিবা শিবের রত্নকাশী;
সোনার কাশী তেজ্য করে আসবেন শঙ্করী।। —একতাল

পরমহংসদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় (২৮ জানুয়ারি ১৮৮৭) ঠাকুর যে সমস্ত গান করতেন তার থেকে মাত্র দুটি গান মুদ্রিত হয়। প্রথমটি হল—

এই হরিনাম (নিস রে) জীব যদি সুখে থাকবি
(মধুর হরি নাম) জীবের দশা মলিন দেখে, হরি নাম
এসেছেন গোলোক থেকে, মুখি হরি হরি হরি বল,
হরি বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল থাকলেও ভাল
রচয়িতা অজ্ঞাত, তাল : আড়াঠেকা
এই গানটির পাঠান্তর পাওয়া যাবে কথামৃত গ্রন্থে।

আর 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় গানটি এইরকম—

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
ও মন তুই দেখিস আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
নয়নকে প্রহরী রাখি, সে যেন সাবধানে থাকে।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো,
রসনাকে সঙ্গে রাখ, সে যেন মা বলে ডাকে।।

এই গানটিরও অনুরূপ পাঠান্তর পাওয়া যাবে কমলাকান্ত পদাবলীতে। রাগ : কালেংড়া, তাল : ঢিমেতেতালা

উপরোক্ত গানদুটি ঠাকুরের প্রিয় সঙ্গীতের প্রথম স্বীকৃত ও প্রকাশিত রূপ, যার শিরোনাম ছিল 'পরমহংসের গান'। যেটি পরমহংসদেবের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের আত্মিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য। যদিও ওই একই পত্রিকায় খোলাখুলি প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'ধর্মবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিক ধর্মানুরাগ, আশ্চর্য ত্যাগ স্বীকার, কঠোর বৈরাগ্য, গভীর প্রেম প্রভৃতি গুণসকল দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম.... (ধর্মতত্ত্ব — ১ অক্টোবর, ১৮৮৬)।

যাঁর কৃপাকটাক্ষে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ উদ্ভাসিত হতে পারে,এমন মহাশক্তি ঠাকুর নিজেকে সর্বদাই আড়ালে রাখতেন। এর আগে 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এই আধারে রামকৃষ্ণ' নিজেকে দেখিয়ে এ ঘোষণা ঠাকুর করেছেন। এবারে একটি গান প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজের মহাস্বরূপের ও মহিমার অপরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, সেটির এক চাক্ষুষ এবং জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন মহেন্দ্র নাথ দত্ত— .... একদিন সুরেশ মিত্তির ফরমাশ দিয়া একটি অতিসুন্দর বেলফুলের গড়েমালা আনাইয়াছিলেন। মালাটি বেশ বড়, এত বড় যে গলায় দিয়া দাঁড়াইলে মালাটি জাজিমের উপর পড়িয়া আরও খানিকটা বেশি থাকে। সুরেশ মিত্তির ওই মালাটি লইয়া পরমহংস মশাইয়ের গলায়

> পাপ তার পারা কেউ হজম করতে পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তা হলে কোন দিন না কোন দিন গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ করলেও তেমনি তার ফল একদিন না একদিন নিশ্চয় ভোগ করতে হবে।

পরাইয়া দিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিলেন।.... মালাটি তক্তাপোশের উপর জাজিমে ঠেকিয়া লুটাইতে লাগিল।

'.... আর কি সাজাবি আমায়

জগৎ-চন্দ্র যার আমি পরেছি গলায়'— গানটি গাহিয়া নানাপ্রকার হাতের ভঙ্গী করিয়া উপরের দিকে দেখাইতে লাগিলেন। ঠিক যেন এই ভাবটি তখন প্রকাশ হইতে লাগিল— কি একটা ফুলের মালা গলায় পরাচ্ছ, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সব তো আমার গলায় হারের মতো রয়েছে। অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র দেহটির ভিতর এক বিরাট পুরুষ রহিয়াছেন; চন্দ্রাদি গ্রহসমূহ তাঁহার গলার হারের মতো; তিনি আরও ঊর্ধ্বের লোক— তিনি বিরাট, অসীম, অনন্ত ও মহান।

.... সেই কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে।.... তিনি যেন হাত নাড়িয়া বলিতেছেন— ' জগৎ তুচ্ছ, জগতের এই জিনিস দিয়ে আমায় কী সাজাবে? অনন্ত, অনন্ত সব গ্রহ-তারা, আমি তো সর্বদাই সেই সকল প'রে থাকি। তার চেয়ে আমার মাথা আরও উপরে...।

কৃতজ্ঞতা :— (১) শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ : কমলকৃষ্ণ মিত্র, (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান : মহেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ) : স্বামী সারদানন্দ, (৪) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়সঙ্গীত, সম্পাদনা : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, (৫) সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, (৬) শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিকথা : হরিহর চট্টোপাধ্যায়, (৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত : রামচন্দ্র দত্ত, (৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা : অক্ষয়কুমার সেন, (৯) স্মৃতিকথা : স্বামী অখণ্ডানন্দ, (১০) বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ : উদ্বোধন, (১১) আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ, (১২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রীম।

ফাতনা ডোবার ইতিকথা

অর্ণব নাগ

ব্যাপারটাকে রসিককৃষ্ণের রসিকতা বলে উড়িয়ে দেওয়াটা মোটেই সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না। ধর্ম জিনিসটা যেন ছেলেখেলা! হিঁদুর ছেলে বলে কি না 'আমি গঙ্গা মানি না'! আদালতের ইন্টারপ্রিটারের ব্যাখ্যাটা আরও মারাত্মক — "I do not belive in the sacredness of the Ganges"। সমাজপতিরা রে রে করে উঠলেন— কালেজ (তার নাম যতই হিন্দু হোক)-এর শিক্ষার ফল দেখ! সিঁদুরীয়াপট্টীর মল্লিকবাড়ির ছেলে কিনা গঙ্গাজলের পবিত্রতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে! রাজা রামমোহনের অনুরাগী এবং ডিরোজিও-র অনুগামী ইয়ংবেঙ্গল-এর দাপটে সত্যি-মিথ্যের ভেদরেখা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে— যা ভাবছি, তাই বলবো, কোনও ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করবো না। সময়কাল — ১৮১৭-১৮৩৫।

সময় নামক গড্ডালিকা প্রবাহের মরিয়া দৌড়। একদিকে মাল খেয়ে মাতলামি, ভ্রষ্টামি-নষ্টামি। অন্যদিকে সত্য প্রতিষ্ঠার জিগির। বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'পুরনো বাংলার অবসান হইতেছে এবং নতুন বাংলা উঠিতেছে'। ইতিহাসবিদরা বললেন, রেনেসাঁ। তবে এই রেনেসাঁর মধ্যগগনে পৌঁছতে এখনও ঢের দেরি। সবেমাত্র ঊষার আলোটুকু প্রতীয়মান। বলা ভালো, যা চলছে তা আসলে 'প্রাক-রেনেসাঁ পর্ব'। সময়ের দৌড়ে রামমোহন অতীত, ডিরোজিও অতীত, রসিককৃষ্ণ অতীত, মায় হিন্দু কালেজও অতীত (প্রেসিডেন্সী কলেজ অবশ্য সেই অতীতেরই স্মৃতিবাহী)। তবে তার রেশটুকু থেকে গেছে। সময়কাল — ১৮৬০-১৮৭৫।

এর সুযোগ নিতে দেরী করলো না একদল খৃস্টান পাদরী। যীশু তাদের কাছে বোধকরি একপ্রকার ব্রাত্যই। তারা বরং অনেক বেশী উৎসাহিত বোধ করতো বৃটিশদের রাজদণ্ডকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে। এনিয়ে মহেন্দ্রনাথের বর্ণনাটা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য— ''... খৃস্টান পাদরীরা সকলকে খৃস্টান করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিল। ইংরেজ পাদরী ও সহকারী দেশীয় পাদরীর সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা গলির মোড়ে মোড়ে, বাজারেও নানা স্থানে যাইয়া হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের কুৎসা ও অসারতা প্রচার করিতে লাগিল। পাদরীরা বলিত যে, গঙ্গাস্নান করা কু-সংস্কার, তেল মাখিয়া স্নান করা কু-সংস্কার, দাড়ি কামানো কু-সংস্কার। এইজন্য আমরা দাড়ি কামাইতাম না। তাহারা বলিত, হিন্দুদের যাহা কিছু আছে, তাহাই কু-সংস্কার; শুধু তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। হিন্দু ধর্ম মানেই হইল, কু-সংস্কার, হিন্দু ধর্ম মানেই হইল যাহা কিছু সব ভুল''। পক্ষান্তরে তৎকালীন হিন্দু সমাজের অবস্থাও তথৈবচ। মহেন্দ্রনাথের বর্ণনায়, ''হিন্দু ধর্ম যে কি, তাহা অনেকেই তখন বুঝিত না। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কাহারো বিশেষ কিছু পড়াশুনা ছিল না, এবং হিন্দু ধর্মের বিষয় কোনও গ্রন্থও তখন পাওয়া যাইত না। এইজন্য পাদরীদের কথার উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য ছিল। আবার পাদরীরা ছিল ইংরেজ। পাদরীরা কিছু বলিলে, পাছে হাঙ্গামা হয়, সেইজন্য সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিত না।'' এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা এ নিয়ে একটি অসাধারণ বিশ্লেষণ উৎসাহী পাঠকের সামনে হাজির করেছেন— ''য়ুরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি উক্তি আছে : "First send the missionaries, then send the merchants and last send the army" । ইহার অর্থ এই যে, একটি দেশ জয় করিতে হইলে প্রথমে ধর্ম-প্রচারকদিগকে পাঠাইবে, পরে বণিকদিগকে এবং সর্বশেষে সৈন্যদলকে পাঠাইবে। ভারতবর্ষেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। এই জন্য পাদরীদিগকে আমরা সশঙ্কচিত্তে দেখিতাম; শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা নয়, অতিশয় ভয় করিতাম''। এই পাদরীদের বিরুদ্ধে অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ) যে একবার উত্তর কলকাতার হেঁদুয়ার ধারে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন, তা জানিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ। তবে সেইসময় এদের বিরুদ্ধে একা কুম্ভ রক্ষা করেছেন কলুটোলার সেনবাড়ির ছেলে এবং রাজা রামমোহনের আজীবন বিরোধী দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। ধর্মান্দোলনের পূর্বসূরী দেবেন ঠাকুরের দেওয়া উপাধি 'ব্রহ্মানন্দ' তাঁর গলায় রত্নহার হয়ে ঝুলছে। সমাজ সংস্কারে এই মানুষটি নতুন দিশা দেখালেন। মহেন্দ্রনাথ দত্তের অনুপম লেখনী— ''... সমস্ত দেশটা যাহাতে খৃস্টান না হইয়া যায়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি খৃস্ট ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মাঝামাঝি একটি সেতু তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিলেন। যীশুকে তিনি 'ওরিয়েন্টাল খৃস্ট' — প্রাচ্য দেশীয় যীশু ও তপস্বী যীশু করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। তিনি কতকগুলি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাগুলিতে তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, বিলাতী হ্যাট-কোট ত্যাগ করাইয়া দেশী যীশু করো এবং যীশুবিহীন যীশুর ধর্ম মানো। কেশববাবু হিন্দু ধর্মের বিগ্রহ পূজাদি ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ভক্তির পথ অবলম্বন করিলেন। ইহাতে শিক্ষিত লোকের ভেতর খৃস্টান হওয়া কিছু পরিমাণে কমিয়াছিল। ব্রাহ্ম ধর্মে কিছু পরিমাণ খৃস্ট ধর্ম ও কিছু পরিমাণ হিন্দু ধর্মের আচার-পদ্ধতি মেশানো ছিল।''

সময়টা এমনই উত্তাল যে তাল সামলানো নিদারুণ মুশকিলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজপড়ুয়া রসিককৃষ্ণের বিদ্রোহের সময় তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হননি, কিন্তু যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরের ছোট ভট্‌চায— মাঝের দীর্ঘ সিকি-শতাব্দীরও বেশী সময়ের ব্যবধানের ব্যপ্তিতেও নতুন দিনের প্রহর গোণা শেষ হয়নি। উনিশ শতকের রেনেসাঁর সূর্যের অভিমুখ ক্রমশ মাথার উপরে। মাহেন্দ্রক্ষণের পটভূমি রচিত হচ্ছে অন্যভাবে। সমাজ-সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্মে ঈশ্বরীয় জিজ্ঞাসা কোথায়? ঈশ্বরবিহীন ধর্মের হুজুগে সমাজ তোলপাড়। দক্ষিণেশ্বরের ছোট ভট্‌চাযের ছোট থেকেই চাল-কলা বাঁধা বিদ্যায় প্রবল অনীহা। রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সামান্য পুরোহিত। কে তাঁর খবর রাখে? যদিও ইনিই হচ্ছেন উত্তরকালের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তবে রাণীর জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস সেই সময়েই চিনতে পেরেছেন তাঁর

অক্টোবর ১৮৮৩ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪-র ফটো।
স্থান : রাধাকান্ত মন্দিরের বারান্দা, দক্ষিণেশ্বর

'বাবা'র স্বরূপ। যা হোক, এঁর ঈশ্বরীয় অনুসন্ধান খুব দ্রুত এগিয়ে আনছে রেনেসাঁর মাহেন্দ্রক্ষণ। ঈশ্বরীয় অনুসন্ধানেই তিনি একদিন মথুরাবাবুর সঙ্গে হাজির জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে। সেখানেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। সময়কাল— ১৮৬৪। যদিও ঠাকুরের সঙ্গে কেশব সেনের প্রথম সাক্ষাতের সময়কালটি বিতর্কিত। স্বয়ং রামকৃষ্ণকথামৃতেই এনিয়ে দু'টি ইংরেজি সন (১৮৬৪ ও ১৮৭৫)-এর কথা উল্লিখিত হওয়ায় এব্যাপারে একটু সংশয় তৈরি হওয়া খুব একটা আশ্চর্যের নয়। যদিও পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণাদি বিচার করে ইংরেজি ১৮৬৪ সালেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ঠাকুরের বেদনা-বিধুর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে সেদিনের বর্ণনা ; সঙ্গে সেই মারাত্মক উক্তিও— ''কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাকের (বেদীর) উপর ক'জন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ! মেজবাবু (মথুরামোহন)-কে বললুম, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে! ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুনো মনে করছিল (মান-টানগুলো) হয়ে গেল''।

কেশবচন্দ্রের পারিবারিক ও ধর্মজীবনে আগাগোড়াই বিশাল দ্বন্দ্বের ছোঁয়া। আদর্শগত কারণে ১৮৬৬ সাল নাগাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁর। প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ (Brahmo Samaj of India)। কথামৃত-রচয়িতা শ্রীম ; ঠাকুরের মুখনিঃসৃত উপরোক্ত বর্ণনায় আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করলেও আদতে সেটা তখন ছিল মহর্ষির 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ'। বিচ্ছেদের পর 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' পরিবর্তিত হয়ে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'-এ পরিণত হয়। ১৮৭০ সালের শেষে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমাজ সংস্কারে জোয়ার আনলেন কেশবচন্দ্র। শিবনাথ শাস্ত্রীর কলমে সেই সময় তাঁর সমাজ সংস্কার সাধনে ব্রতী হওয়ার কিছু খতিয়ান— ''ভারত-সংস্কার সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে

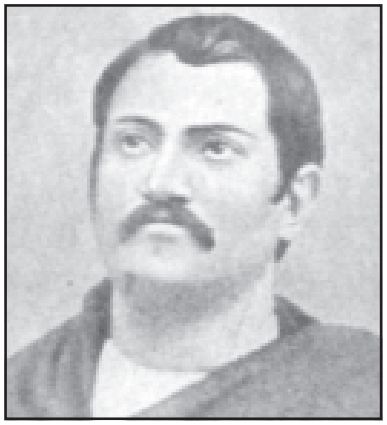

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

পাঁচ প্রকার কার্যের আয়োজন করিলেন : (১ম) সুলভ সাহিত্য, (২য়) সুরাপান নিবারণ, (৩য়) শ্রমজীবী অন্দোলন, (৪র্থ) স্ত্রী-শিক্ষা, (৫ম) দাতব্য বিতরণ''। ফাতনা ডোবা কেশবকে ঠাকুর চিনেছিলেন আগেই, কেশব ঠাকুরকে চিনলেন তার ঢের পরে, ১৮৭৫-এ, বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। যে সময় কেশব সেনের ব্যাণ্ড অফ হোপ নতুন আশার আলোয় গুঞ্জরিত করছিল বঙ্গীয় যুবকদের। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমারই ল্যাজ খসেছে, অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসারের বাহিরেও থাকতে পার, আবার সংসারেও থাকতে পার। যেমন ব্যাঙ্গাচির ল্যাজ খসলে জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে'। সেই দর্শন কেশবচন্দ্রকে এতটাই মোহিত করেছিল যে, ওই বছরেরই ২৮ মার্চ রবিবাসরীয় 'মিরার' সংবাদপত্রে রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে অনন্যসাধারণ উক্তি করেছিলেন তিনি— ''আমরা অল্প দিন হইল, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্ত স্বভাব, কোমল-প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে আছেন।

এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত যোগীপুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে?" এই কেশবচন্দ্রই ১৮৬৬ সালের ৫ মে আর স্কট মনক্রিফ নামে জনৈক বিলিতি সওদাগরের বাঙালীদের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করার প্রতিবাদে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হলে "Jesus Christ, Asia & Europe" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার ফল হলো মারাত্মক। ইংরেজরা তাঁকে খৃস্টান বলে ধরে নিল, কেশবচন্দ্রকে 'ধর্মচ্যুত' বলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন সমাজপতিরাও। এর প্রতিকল্পে ২৮ সেপ্টেম্বর "Great men" শীর্ষক বক্তৃতায় জগতের মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিও তাঁকে নিন্দের হাত থেকে রেহাই দেয়নি। অথচ ঠাকুরের সঙ্গে এক মুহূর্তের মিলনে কেশব-মানসে প্রবহমান সনাতন ধর্মের ফল্গুধারাটি যেন প্রকাশ হয়ে পড়লো। রেনেসাঁর কালখণ্ডে এর ভূমিকা অপরিসীম।

বাঙালীর ধর্ম জীবনে এমন অস্থিরতা ইতিপূর্বে কখনও তৈরি হয়েছে কিনা তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। উনিশ শতকের রেনেসাঁ যদি বঙ্গ জীবনে মহাজাগতিক সাইক্লোন রূপে আবির্ভূত হয় তবে তার প্রস্তুতিপর্বের ঝড়ের দাপটও নেহাত কম ছিল না। সেই অস্থিরতার ইঙ্গিত মহেন্দ্রনাথ দত্তের কলমে— ''... আমরা অধিকাংশ যুবক খৃস্টধর্ম পছন্দ করিতাম না ও হিন্দুধর্মও মানিতাম না। আমরা পুরনো কিছু মানিতাম না; নতুন যে কি করিতে হইবে তাহাও জানিতাম না। আমরা কোনটা যে ধরিব, তাহা তখন স্থির করিতে পারিতেছিলাম না; মহা অশান্তির ভাব আসিল। যুবকদের মনে প্রচণ্ড আগুন জ্বলিল। কি করিতে হইবে; তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না। পুরনো বাংলা তখন চলিয়া যাইতেছিল এবং নতুন বাংলা আসিতেছিল।"

বঙ্গজীবনে সেই ধর্ম সঙ্কটের মুহূর্তে দক্ষিণেশ্বরের সেই অসামান্য পূজারী আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মিলন। উনিশ শতকের রেনেসাঁর বহুকাঙ্ক্ষিত মোক্ষপ্রাপ্তি। কেশবচন্দ্রের ফাতনা ডুবেছিল আগেই, এবার ছিপে টান দিলেন সেই পূজারী। কে তিনি? তার নাকি 'ট্রান্স' হয়! 'ট্রান্স' শব্দ তখন পুরোপুরি অজানা। লোকে ধরে নিল রোগটার নাম মৃগী। এমনকী একদা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের অতিঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আদর্শগত মনোমালিন্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রীও একে স্নায়ুবিকার প্রসূত রোগ বিশেষ (hysteria or epileptic fits) বলে মনে করতেন। তাঁকে এর জবাব দিয়েছিলেন স্বয়ং ঠাকুরই— ''হ্যাঁ শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে ওই সময় অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এইসব জড় জিনিসগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যার চৈতন্যে জগত সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোন্‌দিশি বুদ্ধি তোমার?" ব্যাপারটা একমাত্র কেশবচন্দ্রই খালি অনুধাবন করলেন। তিনি বললেন, রামকৃষ্ণ 'পরমহংস'। অনেকে ব্যঙ্গ করলো, "Great Goose"। ধর্ম মানে হুজুক নয়, ধর্ম মানে ঠিক সমাজ-সংস্কার নয়, ধর্ম মানে স্রেফ পুজোআচ্চাও নয়। ধর্মের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ঈশ্বরীয় অনুসন্ধান। ঠাকুরের মূল্যবান উপদেশাবলী আজীবন হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন কেশবচন্দ্র— ''তোমরা সাকার মান না তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে প্রেম-ভক্তি আরও বাড়বে। কখন দাস্য, কখন সখ্য, কখন বাৎসল্য, কখন মধুরভাব। কোনও কামনা নাই তাঁকে ভালবাসি, এটি বেশ। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম কিছুই চাই না; কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাহার লীলার কথা; জ্ঞান-ভক্তি দুই-ই আছে। সংসারে দাসীর মতো থাকবে; দাসী সব কাজ করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে আছে। মণিবের ছেলেদের মানুষ করে; বলে 'আমার হরি', 'আমার রাম', কিন্তু জানে, ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন করছ, এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করেছিলেন, সাধন করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়'।

ঠাকুরের উপদেশ যে কেশবচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন তা নিয়ে মাস্টারমশাই ওরফে শ্রীম-র সাক্ষ্য— ''ওখানে (কেশব সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজে) ঠাকুরের দৈবী স্পর্শ রয়েছে। কতবার এসেছেন এখানে। এটি একটি তীর্থ হয়ে রয়েছে। দর্শন করলে উদ্দীপন হয়। কেশববাবুকে কত ভালবাসতেন ঠাকুর। তাঁর ভিতর ঠাকুর উচ্চ উদারভাব ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন নিজে। তাঁর জন্যই নববিধানের ভক্তগণ 'মা, মা' বলে পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন।"

কেশবচন্দ্রের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ঘিরে উনিশ শতকের সাতের দশকে একটা অদ্ভুত জটিলতা। তাঁকে 'কাঁচা আমি' ছেড়ে 'পাকা আমি' গ্রহণ করার উপদেশ ছিল ঠাকুরের — ''কেশবকে বললুম, 'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা' আর আমার এইসব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান-সম্ভ্রম— এ ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। তখন কেশব বললে, মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বললুম, কেশব তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্তা', 'আমার স্ত্রী-পুত্র', 'আমি গুরু'— এসব অভিমান, 'কাঁচা আমি'। এইটি ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে থাক— 'আমি তার দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা'। এই উক্তির প্রেক্ষাপট একান্তভাবেই বিচার্য। ১৮৬৮ সাল কেশব সেনের জীবনে একটা অদ্ভুত রকমের জটিল সময়। এই বছরেই ২৪ জানুয়ারি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তিনি এই বছরেই অ্যাডভোকেট জেনারেল কাউই সাহেবের কাছে জানতে পারেন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দু বা মুসলমান বিবাহের মতো বৈধ নয়। এ নিয়ে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ৫ জুলাই যে বিতর্কসভা বসে তাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তি সত্ত্বেও এই বিবাহ আইনসিদ্ধ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এনিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা চলতেই থাকে। উপায়ান্তর না দেখে ব্রাহ্মরা 'হিন্দু নন' বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন কেশবচন্দ্র। অন্যদিকে বিহারের মুঙ্গেরে ১৯ এপ্রিল, ২৩

মে, ৭ জুন ব্রাহ্মসমাজের একদিন ব্যাপী উৎসবে ভক্তবৃন্দ উৎসাহের আতিশয্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পায়ে লুটিয়ে পড়ে জিনিসটাকে 'নরপূজা'র পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যদুনাথ চক্রবর্তী, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতা এতে প্রচণ্ড বিরক্ত হন এবং নরপূজার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনই চরম আকার ধারণ করে ঠিক এর এক দশক বাদে, ১৮৭৮ সালে অন্য একটা কারণে। কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের নাবালক রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের বিবাহকে কেন্দ্র করে বঙ্গের নারী আন্দোলন ও স্ত্রী-শিক্ষার পুরোধা পুরুষ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম-নেতার। এঁরা কেশব সেনের সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গঠন করেন। তখন থেকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-ও 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' নামে চিহ্নিত হয়। যে সমাজকে দাঁড় করাতে জীবনের বাকি ছ'টা বছর কেশবচন্দ্র অমানুষিক পরিশ্রম করেন এবং তাঁর এই সমাজে ঠাকুর যে বহুবার পদার্পণ করে তা ধন্য করেছিলেন শ্রীম-র মুখনিঃসৃত বর্ণনায় পাঠক জেনে গেছেন আগেই।

শুধু নিজের সমাজের লোকই নয়, রেনেসাঁর ব্রাহ্মমুহূর্তে ভিন্ন পরিমণ্ডলের বহু মানুষও ভুল বুঝেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে। যেমন ঠাকুরের পরমভক্ত, আদতে নেপালী কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মনে করতেন, কেশব সেন ভ্রষ্টাচারী, স্বেচ্ছাচারী; তিনি সাধু নন, 'বাবু'। ঠাকুরকে কেশবচন্দ্রের কাছে যেতে মানা করলে বিরক্ত ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, ''তুমি লাটসাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে। তবে না তুমি বল 'ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ'— যিনি ঈশ্বর, তিনিই এইসব জীব জগৎ হয়েছেন"।

কেশবচন্দ্রের সমাজ সংস্কারের নৌকো গঙ্গাবক্ষে। অনেকগুলো নতুন মুখ— সিমলের নরেন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তর চব্বিশ পরগণার সিকড়ে-কুলীন গ্রামের রাখালচন্দ্র ঘোষ, সাবর্ণ চৌধুরী বংশের যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটের শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, হুগলী জেলার ময়াল ইচ্ছাপুর গ্রামের শশীভূষণ চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। দূরে দেখা যায়, রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণী মন্দিরের চূড়া। আধ্যাত্মিক ঢেউয়ের তরঙ্গ উঠেছে। আছাল-পিছালি স্রোত। নৌকো উল্টোল। ভাবসাগরে হাবুডুবু কেশব আর তার দলবলের। দক্ষিণেশ্বরের সেই পূজারীর স্বরূপ তখন অনেকটাই উদ্‌ঘাটিত। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়াটাই যা বাকি! তিনি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছেন, 'আয়, আয়'। সেই ডাক কালের প্রতীক্ষায়। সেই ডাকে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ, রাখালচন্দ্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগীন্দ্রনাথ স্বামী যোগানন্দ, শরৎচন্দ্র স্বামী সারদানন্দ, শশীভূষণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তবে বঙ্গজ রেনেসাঁকে সূচিত করে অবসান হতে চলেছে আর একটা কালের। অসুস্থ কেশবচন্দ্র। সময়কাল— ১৮৮৩। চিন্ময়ী মায়ের কাছে কাতর ঠাকুর, ''মা, কেশবকে ছাড়া থাকবো কি করে?" অন্যদিকে অসুস্থ কেশব সেনকে তিনি বলছেন— ''তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওইরকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পর শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার ওপরে জল ধপাস ধপাস করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়লো।" কেশব সেন জানতেন, তাঁর পরমহংস 'ধরা দেন না'। তাই নানা ভাবের তরঙ্গে পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে কখনও উনবিংশ শতাব্দীর চৈতন্য, কখনও বা গৌরাঙ্গ, কখনও যীশুখৃস্ট, কখনও জন দি ব্যাপটিস্ট, শেষমেশ আর কিছু না পেয়ে ঠাকুরকে নববিধানী (তাঁর প্রতিষ্ঠিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গ) হিসেবেও অভিহিত করেছেন কেশবচন্দ্র। শ্রীম মনে করতেন, কেশব সেন গোড়াতেই যদি ঠাকুরের কাছে আসতেন তাহলে সমাজ সংস্কার নিয়ে এতটা ব্যস্ত হতেন না। জাতিভেদ ওঠানো, বিধবা-বিবাহ, অন্য জাতে বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক কর্মে অতটা ব্যস্ত হতেন না তিনি। ঠাকুর দেখেছিলেন, 'কেশব এখন কালী মানেন— চিন্ময়ী, কালী আদ্যাশক্তি। আর মা-মা বলে তাঁর নামগুণকীর্তন করেন। রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেই অসাধারণ উক্তির সার্থক প্রতিফলন যেন এতদিনে দেখা দিল— ''তিনি (রামকৃষ্ণদেব) জীবলোক ও শিবলোকের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করে দিয়েছেন। যাঁর যখন খুশি এই দুই লোকের মাঝখানে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে পারেন"।

কেশবচন্দ্রের ফাতনার সামনে অনেকগুলি মাছের ঘোরাঘুরি— ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষার। বড়শির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ঠাকুরের হাতে। ঠাকুরের উপস্থিতিতে নিজের বাড়িতে একঘর লোকের সামনে একবার কেশবচন্দ্র বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর যেন আমরা ভক্তি নদীতে একেবারে ডুবে যাই।' চিকের আড়ালে সেখানে মেয়েদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে সহাস্য ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভক্তি নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে, তাহলে চিকের ভিতর যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের দশা কি হবে? তবে এক কর্ম করো, ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না।'

একথা শুনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অট্টহাস্য। তার ফাঁক দিয়ে শতাব্দীর রেনেসাঁও বোধকরি একটু মুচকি হেসে নিল।

ঋণগ্রন্থ ঃ—

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেরঅনুধ্যান — মহেন্দ্রনাথ দত্ত, (২) শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত — শ্রীম, (৩) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত) --- শিবনাথ শাস্ত্রী, (৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)— স্বামী সারদানন্দ, (৫) চরণচিহ্ন ধরে — নির্মল কুমার রায়, (৬) ধর্মযুদ্ধ — সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (বর্তমান, শারদ সংখ্যা ১৪১৭)।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত

বিনায়ক সেনগুপ্ত

'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা, ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয় — বেদান্তের সার কথা হল এই। বেদান্ত শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্যই হল জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুত এক ও অভিন্ন।

জীব ভ্রমবশতঃ নিজেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক জ্ঞান করে। এর মূলে আছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর হলে পরমাত্মা প্রকাশ পান। তখন ব্রহ্মময় জগৎ। 'সর্বং খলু, ইদং ব্রহ্ম।' ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। এই হল বেদান্ত ও অদ্বৈত তত্ত্ব। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।

অদ্বৈত বেদান্ত আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, জগতে যা কিছু পদার্থ আছে, যা যা ব্যাপার ঘটছে, সে সমস্তই ব্রহ্ম। বলা হয়ে থাকে যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই যে জগৎ যা আমরা দেখছি, তা আর কিছুই নয়, ব্রহ্মের অধ্যাস মাত্র। বৈদান্তিক উদাহরণ দেন— মরীচিতে যেমন মরীচিকার অধ্যাস হয়, রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রমের অধ্যাস হয়, শুক্তিতে যেমন রজতভ্রমের অধ্যাস হয়, তেমন ব্রহ্মেও জগৎ ভ্রম হচ্ছে। রজ্জু জ্ঞান হলে যেমন সর্পভ্রম দূর হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হলেও ব্রহ্মে অধ্যস্থ জগৎ ভ্রমও চলে যায়। আসলে জীবাত্মা আর কিছুই নয়, জীবাত্মা হল উপাধি অবচ্ছিন্ন পরমাত্মা। আত্মা একটাই। উপাধির অবচ্ছেদ বশেই নানা রূপের প্রতীতি হচ্ছে। সমুদ্র, তরঙ্গ, লহরী, ফেন যেমন জল থেকে আলাদা নয়, জল-ই। তেমনি এ জীব, সে জীব, কোনও জীবই অজ্ঞান ছাড়া কিছু নয়। যেমন শ্রুতিতে আছে, পরমেশ্বর বহু মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন'। নানা উদাহরণে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হতে পারে। যেমন সুবর্ণ, কুণ্ডল, হার এসবই সোনায় তৈরি গহনার আলাদা আলাদা নাম। রূপভেদে, আকারভেদে গহনাগুলোর একেক রকমনাম। বেদান্ত বলবে— এগুলো শুধুই নাম, রূপের ভ্রান্তি। আসলে এগুলো কিছুই নেই, আছে শুধু সোনা।

মাটি দিয়ে তৈরি হয় নানান প্রয়োজনের জিনিস। হাঁড়ি, কলসি, মালসা, সরা আরও কত কি। এই মৃন্ময় বস্তুগুলো আসলে মৃত্তিকারই বিকার। অনিত্য। এই আছে, এই নেই। কিন্তু মাটিটাই আসল, মাটিটাই সত্য, নিত্য। তাই মৃত্তিকা অর্থাৎ মাটিকে জানলেই তাবৎ মৃন্ময় বস্তুকে জানা হয়ে যায়। মৃত্তিকাই হল উপাদান কারণ।

উপাদান কারণ জানলেই বস্তু জানা যায়। সোনাকে জানলেই সোনায় তৈরি নানা গহনার জ্ঞান হয়। মাটিকে চিনলে জানলে মাটি দিয়ে তৈরি সব জিনিসকেই চেনা যায়, জানা যায়। সেইরূপ ব্রহ্মই হল জগতের উপাদান কারণ। সুতরাং ব্রহ্ম জানলেই জগতের সব বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে— 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'। এই একই ভাবনা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যাচ্ছে — 'স যথোর্ণনাভিস্তন্তু নোচ্চরেদ্, যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ...'। (যেমন উর্ণনাভি হইতে তন্তু নির্গত হয়, যেমন অগ্নি হতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ আত্মা হতে সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত, সমস্ত দেব নির্গত হয়েছেন)।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম, জীব, জড়, জগৎ কিছুই আলাদা নয়। জীব হলো ব্রহ্মরূপ উর্ণনাভির ঊর্ণা বা তন্তু। ব্রহ্মরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

জীবাত্মা যখনই অবিদ্যা বা অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়, তখনই সে সর্বভূতে আত্মা ও আত্মাতেই সর্বভূত দেখে।

গীতাতে বলা হয়েছে—

'বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনিঃ।।

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণে,গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে, চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। অর্থাৎ তাঁরা সকলকেই একই বহ্ম বলে জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী। তিনি সকলের মধ্যেই সেই একই আত্মাকে দর্শন করতেন। জমিদার আর মেথরে কোনওদিন কোনও তফাৎ করেননি। সকলেই তাঁর আপন, কেউ পর নয়। সকলের মধ্যেই তিনি নারায়ণের প্রকাশ দেখতেন। নর-নারায়ণ। বলতেনও তিনি— 'এক সোনাতে নানারকম গহনা তৈরি হয়। গহনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হলেও যেমন সকলই এক সোনা, সেইরকম ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন দেহে পূজিত হন এবং বিভিন্ন নামে ও ভাবে পূজিত হলেও সকলকার ভেতর এই একই ঈশ্বর।'

বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ না করেও এই সাধক পুরুষটি ছিলেন বেদান্ত পারগ। ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন,— 'সত্য বলছি, আমি বেদান্তাদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আবার গীতার সার কি? গীতা দশবার বললেই যা হয়, ত্যাগী, ত্যাগী।'

বেদান্তশাস্ত্র পাঠ তো দূরের কথা, মানুষটি পাঠশালার চৌকাঠ পেরোননি। অথচ বেদান্ত শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বগুলো অবলীলায় কী অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্তজন সমীপে একের পর এক সহজ সরল ভাষায়, হাস্য-পরিহাস ছলে ব্যাখ্যা করে চলেছেন—

'কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না' এক ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঠাকুর বললেন— 'অহঙ্কারই সব আবরণ করে রেখেছে। যদি অহং বুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা

যায় না— মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। অহং যেন মেঘের স্বরূপ। যদি অহং বুদ্ধি যায় তবেই ঈশ্বর দর্শন হয়'।

উপমা টেনে বোঝালেন— 'এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি, আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পারছ না।'

পাঠক লক্ষ্য করুন— ঠাকুর এই যে আবরণের কথা বললেন, এ তো একেবারেই বেদান্তের কথা। বেদান্ত বলে, অজ্ঞানের দুটো শক্তি। আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। যে শক্তি আত্মার যথার্থ স্বরূপকে ঢেকে রাখে, সে শক্তির নাম আবরণ শক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এভাবেই বেদান্তের বাণীটিকে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

বেদান্ত বলে— আত্মজ্ঞ ব্যক্তি দৃশ্যমান জগৎ দেখেও দেখেন না। অর্থাৎ সত্য বলে মনে করেন না।

'যথা, ঐন্দ্রজালিক পদার্থের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে দেখেন মাত্র, তাহার সত্যতা মনে করেন না।

১০ ডিসেম্বর, ১৮৮১ সালে কলকাতায় বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স-এর রাধাবাজার স্টুডিওতে তোলা হয় ঠাকুরের এই ছবিটি।

বেদান্তের এই তত্ত্বটি ভক্তদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন ঠাকুর একটি গল্পের অবতারণা করে—

'একটু বেদান্তের বিচার শোনো। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে একজন সওয়ার আসছে, ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ, হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সভাসুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার করছে এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া তো সত্য নয়, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্র সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে।' ঠাকুর তাই বলছেন— 'জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কিস্বরূপ। বাজীকর সত্য, বাজীকরের ভেল্কি অনিত্য।'

একই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন— 'মায়াকে চিনতে পারলে মায়া আপনি পালায়; যেমন চোর বাড়িতে এসেছে গৃহস্থ টের পেলে চোর আপনি পালায়।'

'অদ্বৈতজ্ঞান' বোঝাতে গিয়ে ঠাকুর ব্যয় করলেন দু-তিনটি মাত্র বাক্য— 'গুরু দুই আঙুল উঠিয়ে শিষ্যকে বললেন, ব্রহ্ম ও মায়া। পরে এক আঙুল নামিয়ে বললেন, মায়া গেলেই ব্রহ্মময় জগৎ।' এর থেকে সহজ ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে?

বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়। স্বপ্নের মতন, সব মিথ্যা।

তবু আমরা আমি, আমি করি। অনিত্য সব জাগতিক বস্তুর দিকে হাত বাড়াই— পেলে সুখী হই, না পেলে হতাশ হই, দুঃখ করি।

বেদান্তের এই তত্ত্বটি ঠাকুর একটি গল্প শুনিয়ে কেমন বুঝিয়ে দিলেন—

'এক দেশে এক চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ-বাস করে, পরিবার আছে। একটি ছেলে অনেকদিন পরে হয়েছে, নাম হারু। ছেলেটার উপর বাপ-মা দুজনেরই ভালবাসা। কেন না সবেধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে, কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হলো। কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কি হবে? তারপর আবার চাষ করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরও কাঁদছে। পরিবার বললে, তুমি নিষ্ঠুর, ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না? চাষা স্থির হয়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলবো? আমি কাল একটা ভারি স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম যে, রাজা হয়েছি, খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি— আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করবো, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করবো। গল্প বলা শেষ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা। এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা। আত্মাই কর্তা। ঠাকুর বলতেন, 'গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না।' এও বেদান্তের কথারই এক ব্যাখ্যা। আত্মাই জীবের সর্বস্ব। আত্মাই কর্তা। মানুষ, তার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়— সবই যন্ত্রস্বরূপ। যন্ত্রী তিনিই। আত্মা, ঈশ্বর। আত্মাকে জানলেই অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হলেই আত্মজ্ঞানের আলোয় সমস্ত ভেদ চলে যায়। চলে যায় জাতি, কুল, বর্ণের সব বাধা। তখন বিশ্ব সংসার সব এক। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।

'আমি'কে ত্যাগ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, 'আমি মলে ঘুচয়ে জঞ্জাল'। আমি কে জানা হলেই আমি তুমি হয়ে যায়। নিজেকে

জানো, — 'আত্মানং বিদ্ধি'। উপনিষদের এই বাণীটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের লক্ষ্য করেছিলেন। একথা বলা বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাঙালীর আর এক প্রাণের ঠাকুর রবি ঠাকুরও এই একই সাধনায় ব্রতী ছিলেন আমৃত্যু। সে সাধনা ছিল বেদান্তেরই সাধনা। কবিতায়, গানে তিনি বারেবারেই ফিরে ফিরেই বলেছেন— 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।' কখনও বলেছেন—

''আপন হতে বাহির হয়ে, বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।
এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হয়।''

ফিরে আসি বেদান্ত প্রসঙ্গে। বেদান্ত বলে— 'জীবাত্মা যখন অবিদ্যা মুক্ত হয়ে ব্রহ্মবিদ হন, তখন তিনি ব্রহ্মেতেই লীন হয়ে যান।'

তাই তো ঠাকুর বলেছেন, ব্রহ্ম যে কী তা মুখে প্রকাশ করা যায় না। ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট। মুখে তাকে প্রকাশ করা যায় না। সকলেই জানেন, ঠাকুরের এই কথায় পণ্ডিতোত্তম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও চমৎকৃত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর উপমা দিয়েছেন— লুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছ্‌লো। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক।

এইভাবেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সরস ও সরল ভাষায় বেদান্তের সারসত্য সকলের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই ভগবান নিত্য বিরাজ করেন সেই জীবরূপধারী শিবের সেবাই যেসকল ধর্মের সার— এ কথা তাঁর মতো করে কে আর বলতে পেরেছেন!

তিনি ছিলেন সমন্বয় মূর্ত্তি। সারা জীবনের সাধনা তাঁকে এই তত্ত্বে উপনীত করেছিল যে, সকল ধর্মই সত্য। অনন্ত পথ, অনন্ত মত। সব পথ দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তাঁর এই প্রত্যয়ের সপক্ষে কতই না উদাহরণ দিয়েছেন। 'আমার ঘড়িই ঠিক চলছে। এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়।'

আবার এও বলেছেন, 'সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়, তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পার, বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্যই হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা। সারা বিশ্বেই রয়েছে এক প্রাণ, আত্মা। পৃথকের যে ধারণা তা সত্য নয়। বেদান্তের মূল সূত্রটিই হল একত্ব প্রতিষ্ঠার। হাজার হাজার বছর আগে ঋগ্বেদের ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' সেই এক সত্যকে বিপ্ররা বহু বলেন। ঈশ্বর এক সেই ঈশ্বরের প্রকাশই মানুষের মধ্যে। যুগ যুগান্ত থেকে এটাই ভারতের সাধনা। এই সাধনারই মূর্ত রূপ হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তো ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সমন্বয় মূর্তিকেই প্রণাম জানিয়ে লিখেছেন—

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও ঠাকুরের দেখানো পথেই

অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে হোক, একবার পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়; কেউ যদি স্তবস্তুতি ক'রে পড়ে, সেও অমর হয়, আর কাউকে যদি কোন রকমে ঠেলে সেই অমৃতকুণ্ডে ফেলে দেওয়া যায়, সেও অমর হয়; তেমনি ভগবানের নাম জ্ঞানে অজ্ঞানে বা ভ্রান্তে যে প্রকারে হোক, নিলে তার ফল হবেই হবে।

মানুষ মাত্রকেই নারায়ণের প্রকাশ জ্ঞানে সেবা করার ডাক দিয়েছিলেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি
কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

শিব জ্ঞানে জীব সেবা-র আদর্শই তিনি জগতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'অরণ্যের বেদান্ত'কে কর্মপরিণত বেদান্তে (Practical Adwaitism) প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণপাত করে গিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, অদ্বৈতবাদই ধর্মের ও চিন্তার শেষ কথা। তিনি মনে প্রাণে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, এই অদ্বৈতবাদই একদিন ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। সেদিন আর হানাহানি থাকবে না। বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হবে।

পাঠপঞ্জী ঃ—

বেদান্তদর্শন — স্বামী অভেদানন্দ। বেদান্ত পরিচয় — হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বেদান্ত সার — শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত। ব্রহ্মসূত্র— প্রথম অধ্যায়, প্রথম খণ্ড, শ্রীযদুনাথ মজুমদার সম্পাদিত। প্রস্থান ভেদ : — গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত। উপনিষদ নবক — অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

‘নৈঃশব্দের রূপ’-এ রূপময় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্যামলেশ দাস

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নিছক একজন সাধারণ ধর্মগুরু রূপে দেখলে চলবে না। তিনি ছিলেন ভারত আত্মার এক মূর্ত প্রতীক। ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের এক পথ প্রদর্শক, এক অগ্রপথিক। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও মহান আদর্শের পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন এক মহান অগ্রদূত। বিভিন্ন মতে বিভক্ত এবং বিবদমান ভারত ও বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে ঐক্যের একটি বীজমন্ত্র তিনিই দিয়েছিলেন— ‘যত মত তত পথ’। তাঁর এই একটি উক্তিই বিশ্বব্যাপী সব মত ও পথের যত বিবাদ, বিসংবাদ, বিরোধ ও সংঘাত মিটিয়ে দিয়ে পরমত সহিষ্ণুতার আলোকোজ্জ্বল পথ দেখিয়েছে। তিনি ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মভূত এক মহান মানবাত্মা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের এক নীরব ও নিঃশব্দ সাধক ছিলেন। যে কোনও সংসারে আসক্ত পার্থিব জীবন-যাপনকারী সাধারণ মানুষও ঈশ্বরের আরাধনার অধিকারী বলে তিনি মনে করতেন। সংসারে পাঁকাল মাছের মতো অবস্থান করতে তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বরের আরাধনা লোকদেখানো কাজ নয়। তাই তিনি বলতেন — ঈশ্বরের আরাধনা করবে মনে, বনে আর ঘরের কোণে। এর জন্য ঢাক-ঢোল পেটানোর প্রয়োজন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর সাধনায় এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

তাঁর বিখ্যাত উক্তি, ‘যত মত, তত পথ’কে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, পর্বতশীর্ষে সবাই আরোহণ করবেন। সমতলভূমি থেকে পর্বতশীর্ষে পৌঁছোবার অনেক পথ আছে।

যাঁর যে পথে সুবিধা সে সেই পথে যাত্রা শুরু করবেন। কিন্তু অন্তিমে সবাই এক পর্বতশীর্ষে আরোহণ করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। বড় বড় জ্ঞানগর্ভ ধর্মতত্ত্ব আওড়াতেন না। সাধারণ বৈঠকী আলোচনায় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তিনি সহজ সরল ধর্ম উপদেশ দিতেন।

পরমভক্ত মহেন্দ্র মাস্টার (শ্রীম) এই উপদেশাবলী নথিভুক্ত না করলে বিপুল গ্রন্থবদ্ধ এই দুর্মূল্য কথামৃতের আস্বাদ কেউ পেতেন না। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রমাঁ রলাঁ তাঁর সাধনার মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত হয়ে অল্প কথায় তাঁর প্রতিভার চরিত্রায়ণ করে বলেছিলেন, "He is a man of high introspection" অর্থাৎ, তিনি একজন গভীর ও উচ্চমার্গীয় অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

সেই সময় বাংলায় সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ধারাপ্রবাহ শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত বংশজাত সমকালীন বঙ্গসমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণের নেতারা (cultural leaders of Bengal, Renaissance) তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এমনকি নিরীশ্বরবাদী বিদ্যাসাগরও তাঁর গৃহে আগত শ্রীরামকৃষ্ণকে এক ঘটি নোনাজল নিতে বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর কাছে আগত তাঁর গুণমুগ্ধ এই মনীষীদের সম্পর্কে তিনি বলতেন— এদের সকলের অন্তরে জ্বলছে জ্ঞানের প্রদীপ। কেবলমাত্র নরেনের (স্বামী বিবেকানন্দের) অন্তরে জ্বলছে জ্ঞানের সূর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজের অচলায়তন ভাঙতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই মানসিকতাটি তিনি তার পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গ্রামের প্রতাপশালী অত্যাচারী জমিদারের হয়ে মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় সেই জমিদার কর্তৃক আনীত এক মিথ্যা মামলায় দেনার দায়ে তাঁর বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য ক্ষুদিরাম তাঁর এক দয়াপরবশ বন্ধুর সহায়তায় কিছু চাষের জমি ও বসতবাটি দান স্বরূপ পেয়ে রক্ষা পেয়ে যান। বাল্যকাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের মনে ঈশ্বরে মগ্ন সমাধিস্থ অবস্থা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যেত। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়তেন। পরে কানের কাছে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করলে তাঁর সমাধি ভঙ্গ হোত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবনের আরেকটি ঘটনা উত্তর জীবনে তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সূচনাপর্ব বলে গণ্য হয়। উপনয়নের পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধাই মা ধনী কামারণীকে ‘ভিক্ষা-মা’ বলে মনোনীত করেন। একজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে উপনয়নের পর তাঁর স্বজাতির কোনও মহিলাকে ভিক্ষাপ্রদানকারী মাতারূপে বরণ করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই প্রথাভঙ্গ করে তাঁর ধাই মা ধনী কামারণীকেই ভিক্ষামাতা রূপে বরণ করায় তাঁর পরিবারে এবং সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সংকল্পে অটল থাকায় প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আরেকটি পরীক্ষা আসে। জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের বিধবা পত্নী রাণী রাসমণি স্বপ্নাদেশ পেয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দির তৈরি করেন। রাসমণি জাতে কৈবর্ত্ত ছিলেন। কৈবর্ত্ত প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে কোনও পূজারী ব্রাহ্মণ পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার, তার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজারী রূপে এই মন্দিরে যোগ দেন। দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দির আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থ বলে গণ্য হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একজন মহাসাধকরূপে সারা দেশে খ্যাতির শীর্ষস্থানে আসীন সেই সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কাঙাল ভোজনের নামে অতিথি নারায়ণের সেবা হয়ে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং জাতপাত নির্বিশেষে নিজ হাতে সকলের এঁটো পাতা কুড়াতেন। এই কাজের ভিতর দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ জাতপাত নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শীতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুধর্মের সার্বজনীন উদার আদর্শকে বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হতে সহায়তা করেন। এতে সারা বিশ্বে হিন্দুধর্মের প্রভাব এবং পরিধিও বিস্তার লাভ করে। নরনারায়ণের ধারণাটি শ্রীরামকৃষ্ণই বিশ্বের সকল ধর্মকে উপহার দেন।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এলেন শিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের শ্রী নরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানের সূর্য আবিষ্কার করেছিলেন। ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'নরেন, তুই কি চাস?'

নরেন উত্তরে বললেন— 'নির্বিকল্প সমাধি। অপার শান্তি ও মুক্তি।' শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে ভর্ৎসনা করে বললেন— 'ছিঃ, ছিঃ, নরেন, এত স্বার্থপর তুই, কোথায় কালে বৃহৎ বটবৃক্ষের মতো সকলকে ছায়ায় আশ্রয় দান করবি, না তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়েছিস।' ঠাকুরের ভর্ৎসনায় নরেন্দ্রনাথ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সেইদিন থেকেই ভাবীকালের বিশ্বের আর্ত মানবের ত্রাতা, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হল। এর ফলেই ঠাকুরের প্রয়াণের পরেই বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠল রামকৃষ্ণ মিশন। কিছু কিছু ধর্মের সেবার আড়ালে গরীব মানুষের ধর্মান্তরকরণের বজ্জাতিও বাধা পেল। মানবসেবা ধর্মের এতবড় প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এর প্রভাব প্রতিপত্তি দেখেই বিখ্যাত মনীষী ও সমাজবিজ্ঞানী বিনয়কুমার সরকার বলেছিলেন, ''পৃথিবীতে সাম্রাজ্য একটিই। মার্কিন সাম্রাজ্যও নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যও নয়। সেটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য। এটি বিশ্বমানবকে শোষণের সাম্রাজ্য নয়, বিশ্বব্যাপী আর্তমানবের সেবায় নিয়োজিত ভালবাসার সাম্রাজ্য।" (সূত্র : বিনয় সরকারের বৈঠক --- ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪২)। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের এর চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা পৃথিবীর আর কেউ দিতে পারেননি।

যে সকল লোক নিজে কখনো ধর্মচর্চা করে না, অন্যকেও ধ্যান-পূজা করতে দেখলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ধর্ম ও ধার্মিকদের নিন্দা করে, সাধন-অবস্থায় কখনও এরূপ লোকদের সঙ্গ করবে না, তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব ও সাধক জীবনের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমেরিকা প্রবাসী প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক, আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিখ্যাত বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর লিখিত বই 'দি ফেস অফ সাইলেন্স'— আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে 'নৈঃশব্দের রূপ' নামে বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বহু বাঙালী পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকজীবনের এক অমৃতোপম ব্যাখ্যার আস্বাদনের সুযোগ পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ধনগোপল মুখোপাধ্যায় ১৯২৪ সালে সুদূর আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসে কিছুদিন দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়ে অবস্থান করেন। ততদিনে অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও দেশ-বিদেশের নানা মনীষীর কলমে ও রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বহু আলোচিত ও বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। তবুও ধনগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নতুনভাবে অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়মঠে কিছুদিন অবস্থান করলেন। সন্ন্যাসীদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর 'শ্রীম'-র (মহেন্দ্র মাস্টার) পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি কুড়িয়ে বেড়ালেন।

এইসব শ্রমসাধ্য সংগ্রহ ও সশ্রদ্ধ অনুসন্ধানের ফলে তাঁর বিখ্যাত বই 'দি ফেস অফ সাইলেন্স (১৯২৬) প্রকাশিত হয়।

'নৈঃশব্দের রূপ'-এর লেখক ডঃ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে আমেরিকায় বইটি প্রকাশিত হবার পর সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে যায়। বইটির কয়েকটি সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক জীবন অবলম্বনে রচিত বইটিতে হিন্দুধর্মের সমন্বয় ও জনকল্যাণের আদর্শ সারা বিশ্বে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হল। এই বইটি পড়েই রঁমা রঁলা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধির সামান্য উদ্ধৃতি দিয়েই এই আলোচনা শেষ করব। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন, —

''গঙ্গার ধারে কলকাতায় যখন পৌঁছলাম, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। আকাশে অসংখ্য তারা। নীল্‌চে কালো আকাশ মাথার উপরে। তারাগুলো যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে নীচে নেমে এসেছে। ... এই যে গম্ভীর পরিবেশ তার কণামাত্র কি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি? না, পরি না। মানুষের জীবনধারা এমন স্বচ্ছল ও প্রজ্জ্বলন্ত হয় কি করে? এ যেন সত্যের মশাল জ্বেলে বসে আছে। এমন যে, আমাদের যুগের বস্তুতান্ত্রিক কালিমা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কি দেখে এলাম? এতদিন কি বেলুড় মঠে স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম? জীবনের যে সাত্ত্বিক আস্বাদ কোনওদিন পাইনি এখানে এসে তাই পেলাম।''

(সূত্র, নৈঃশব্দের রূপ — পৃঃ ৮)।

Swastika RNI No. 5257/57
18 April - 2011, **Nababarsha Spl.**
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

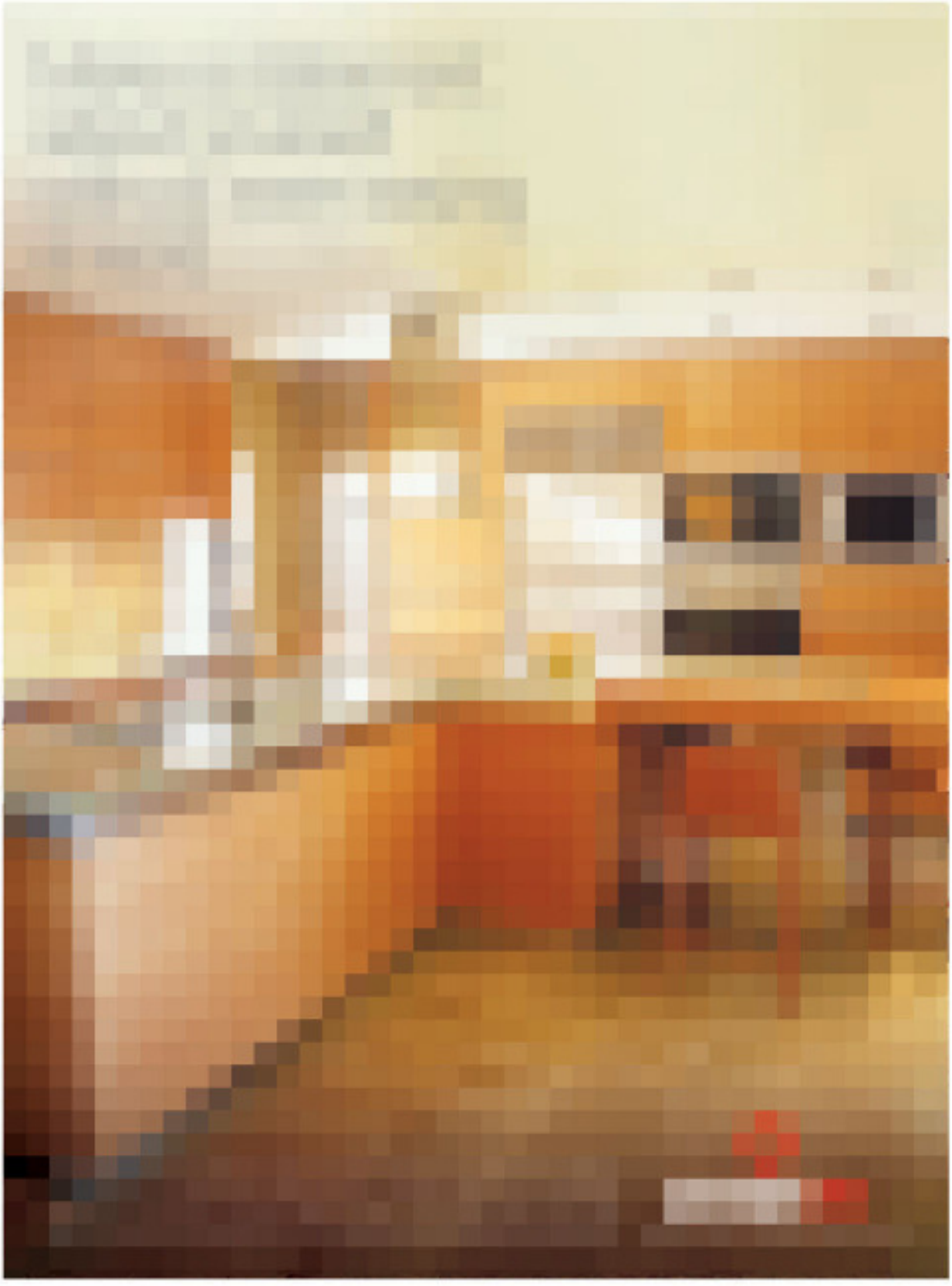

দাম : ১০.০০ টাকা